৮.০৭ বিস্ময়কর গুহা – Bangla Library

৮.০৭ বিস্ময়কর গুহা – Bangla Library

বিস্ময়কর গুহা -১২৭

বনহুর এগিয়ে গেলো নরকংকালটার দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে ভালভাবে পরীক্ষা করে বললো–রহমান, এই নরকংকালটি মাত্র কয়েক দিন পূর্বেও জীবন্ত মানুষরূপে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে ফিরেছে।

হাঁ সর্দার, কংকালটার সঙ্গে এখনও কিছু কিছু মাংস লেগে রয়েছে, কেউ যেন মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।

মনিরা বলে উঠলো–আমার কেমন যেন ভয় করছে।

মাহবুব বিস্ময় নিয়ে দেখছিলো, বললো সে–নিশ্চয়ই কোনো হিংস্র জীবজন্তু আছে এই দ্বীপে...

বনহুর উঠে দাঁড়ালো বললো–এই নরহত্যাকারী মানুষখোকো কোনো হিংস্র জীবজন্তু নয়। কংকাল দেখে মনে হচ্ছে এটা কোন...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, একজন অনুচর উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে-সর্দার, এই দেখুন এখানে একটি অর্ধদগ্ধ সিগারেট পড়ে আছে।

রহমান কথাটা শোনামাত্র এগিয়ে এলো, অনুচরটির হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে বললোসর্দার, নিশ্চয়ই এ দ্বীপে কোনো মানুষ আছে।

বনহুর সিগারেটের টুকরাটা হাতে নিয়ে ভালভাবে লক্ষ করে দেখে বললো–আশ্চর্য। জানতাম এ দ্বীপে কোনোদিন কোনো মানুষের পদক্ষেপ পড়েনি কিন্তু এ সিগারেট প্রমাণ করছে কোনো মানুষ এখানে এই দ্বীপে এসেছে এবং এখনও আছে সে এখানে।

হা সর্দার, আমারও তাই মনে হয়। বললো রহমান।

মনিরা বললো–আমার বড় ভয় করছে। আবার কোন্ বিপদ আমাদের জন্য ওৎ পেতে আছে কিনা কে জানে।

বনহুর সবাইকে লক্ষ্য করে বললো–এসেছি যখন তখন ফিরে যাবো না। তোমরা বিপদের সম্মুখীন হতে তৈরি হও। এই নরকংকাল মাত্র কদিন পূর্বেও জীবিত মানুষ হিসেবে এই দ্বীপে বিচরণ করে ফিরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমরা এগিয়ে চলো।

বনহুর তার সঙ্গীদের নিয়ে মাথুন দ্বীপের আরও গভীরে প্রবেশ করতে লাগলো। পেছনে পড়ে রইলো সেই কংকালটি।

গভীর জঙ্গল হলেও অন্যান্য জঙ্গলের মত তেমন ঝোঁপঝাড় নেই। কাজেই অন্ধকার ততো জমাট নয়। সূর্যের আলো সরাসরি জঙ্গলটাকে বেশ সচ্ছ করে তুলেছে। জঙ্গলের ভেতরেও মাটিগুলো কেমন চক চক করছে। মাটির সঙ্গে সোনা মিশে আছে। মনিরা এবং বনহুরের অন্যান্য সঙ্গীর মনে ভয়ার্ত ভাব জাগলও চারদিকে শুধু সোনা আর সোনা ছড়ানো দেখে খুশীতেও আত্মহারা হয়ে

পড়েছিল। কেউ কোনোদিন ভাবতেও পারেনি এতো সোনা ছড়িয়ে থাকে মাটির মধ্যে।

বনহুরের শরীরে তার নিজস্ব অতিপরিচিত জমকালো পোশাক। পায়ে ভারী বুট, কোমরের বেল্টে রিভলভার ও সূতীক্ষ্ণধার ছোরা।

রহমান, মাহবুব এরাও জমকালো পোশাকে সজ্জিত। এদের সঙ্গেও রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র।

মনিরা স্বামীর পাশে পাশে এগিয়ে চলেছে। তার সতর্ক দৃষ্টি সামনে এবং আশেপাশে। না জানি কখন কোন পথে বিপদ এসে হানা দেয়। মনিরা নিজের জন্য ভাবে না, ভাবনা তার স্বামীকে নিয়ে। যে সব বিপদ মাথা পেতে গ্রহণ করতে রাজি আছে কিন্তু স্বামীকে সে আর বিপদের মুখে পড়তে দিতে চায় না। মনেপ্রাণে দয়াময়কে স্মরণ করে চলেছে সে।

মনিরা বললো–তোমার অনেক আছে, কি হবে আর সোনাদানা ধনরত্ন দিয়ে, চলো ফিরে যাই…

তুমি বড় ভীতু মনিরা। সব সময় ভয় আর দুর্ভাবনা। পরম করুণাময় যখন গভীর সাগরতলে দুর্গম বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করে আনলেন তখন সব বিপদেই তিনি রক্ষা করবেন। আর সোনা-দানা, ধনরত্নের কথা বলছো তো প্রচুর আছে কিন্তু তুমি তো জানো মনিরা, ওসব কি আমি কোনোদিন আমার সুখের বা শান্তির জন্য ব্যয় করেছি? সবকিছুই তো তাদের যারা নির্মমভাবে নিষ্পেষিত শোষিত দুঃখী মানুষ। আমি যদি এই দ্বীপটি নিজের আয়ত্তে আনতে সক্ষম হই তাহলে এ পৃথিবীর কোটি কোটি দুঃস্থ মানুষের মুখে…

বনহুরের কথা শেষ হয় না, হঠাৎ একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হয় তার সামনের বিরাট গাছটার গোড়ায়। চমকে উঠলো সবাই।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকালো চারদিকে। কোন দিক হতে ছোরাখানা এসেছে। কে এই ছোরা নিক্ষেপ করলো।

রহমান এগিয়ে গিয়ে ছোরাখানা টেনে তুলে নিলো। সবাই একবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো নিজেরা, সকলের মনে একই প্রশ্ন, হঠাৎ কোথা থেকে ছোরা এলো এই নির্জন দ্বীপে?

বনহুর রহমানের হাত থেকে ছোরাখানা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তার মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে পড়ছে। কিছু ভাবছে বনহুর।

মনিরা বললো দেখলে কয়েক পা এগুতে না এগুতেই বিপদের সংকেত। এটা কোনো বিস্ময়কর মানুষের কাজ। হয়তো বা জংলিদের কেউ এই দ্বীপে লুকিয়ে আছে।

রহমান বললো–হা সর্দার, আমারও তাই মনে হচ্ছে। একদিন মাথুন দ্বীপ জনমানবহীন ছিলো এখন আর তা নেই। একি! সর্দার, ঐ দেখুন আর একটি ছোরা! ঐ যে…

সকলের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ ফুটে উঠলো। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো অপর একটি বৃক্ষের গোড়ায়। পূর্বের মতই একটি ছোরা বিদ্ধ হয়েছে সেই গাছেও।

বনহুর এবার নিজে গিয়ে ছোরাখানা বৃক্ষের গোড়া থেকে তুলে নিলো। ছোরাটা দেখে বললো সে-ছোরা দু'খানা একই ধরনের ছোরাখানা মাহবুবের হাতে দিয়ে তাকালো সে গভীর জঙ্গলের দিকে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না।

অন্যান্য অনুচর বেশ ভীত হয়ে পড়ছে কারণ তারা জানতে এই দ্বীপে কোনো জনপ্রাণী নেই। এমনকি কীটপতঙ্গও নেই, অথচ এ ছোরা আসছে কোথা থেকে। এরা দুর্ধর্ষ বনহুরের অনুচর। সম্মুখযুদ্ধ তারা একটুও ভয় পায় না। বনহুরের মতই এরাও বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে আনন্দ পায় কিন্তু নির্জন দ্বীপের জঙ্গলে এই রহস্যময় ছোরা-কেমন যেন লাগছে তাদের কাছে।

একজন বললো–সর্দার, আর এগিয়ে কাজ নেই। আমরা এখানেই অবস্থান করি।

বললো বনহুর–বিপদ যদি আসে তা এখানেও যেমন আসবে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলেও তেমনি আসবে। এসেছি যখন ফিরে আর যাওয়া যায়না চলো এগিয়ে যাই।

বনহুর দলবলসহ এগুতে লাগলো।

আরও কিছুটা এগুনোর পর চিৎকার করে ছুটে এলো একজন অনুচর ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো–সর্দার ঐ ঝোঁপটার পাশে আরও একটি নরকংকাল পড়ে আছে। আর আশ্চর্য। সেখানে কমলা লেবুর খোসাও পড়ে আছে।

সকলের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। একি রহস্য!

বনহুর এগিয়ে গেলো। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখলো একটি নরকংকাল বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। কংকালটির স্থানে স্থানে মাংস লেগে আছে তবে গলিত মাংস। একটা পঁচা বিদঘুঁটে দুর্গন্ধ নাকে প্রবেশ করলো সবার।

মনিরা নাকে আঁচল চাপা দিলো।

বনহুরের সঙ্গীরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো কংকালটা তাদের সবার মনে বিস্ময় জাগিয়ে তুলেছে।

রহমান বললো–সর্দার, জানতাম মাথুন দ্বীপে কোনো জীবজন্তু বা প্রাণী নেই কিন্তু সব যেন কেমন আশ্চর্য লাগছে। কিছু দূরেই আমরা যে কংকাল দেখলাম ঠিক এই কংকালটি। অবস্থাও তাই। তা ছাড়া ছোরাই বা কে নিক্ষেপ করছে?

হাঁ রহমান, তুমি ঠিকই বলেছো। আমিও ভাবছি। জানতাম মাথুন দ্বীপে কোনো প্রাণী নেই এমন কি কোনো জাহাজ আজ পর্যন্ত এ দ্বীপে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। একটু থেমে বললো বনহুর–বিনা বাধায় আমরা পৌঁছে গেলাম সেই দ্বীপে। তবে যেটুকু বাধাবিঘ্ন এসেছে তা স্বাভাবিক। আমার মনে হয় আমাদের মতই কোন দল এখানে এসে পৌঁছেছে আমাদের আগেই।

ঠিক বলেছেন সর্দার, কারণ তার বহু চিহ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা। অর্ধদগ্ধ সিগারেটের টুকরা, কমলালেবুর খোসা, নরকংকাল অনেক কিছু....

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে এই ছোরাগুলো। কে বা কারা এভাবে আমাদের আশেপাশে ছোরা নিক্ষেপ করছে। সেই ছোরা নিক্ষেপকারী ইচ্ছা করলে আমাদের দেহ লক্ষ্য করে ছোরা নিক্ষেপ করতে পারে কিন্তু সে তা করছে না।

সত্যি বলেছো। ছোরা নিক্ষেপকারী ইচ্ছা করলে আমাদের ছোরাবিদ্ধ করে হত্যা করতে পারতো। কথাগুলো বললো মনিরা।

মাহবুব এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো, এবার সে বললো–ছোরা নিক্ষেপকারী আমাদের হত্যার উদ্দেশ্যে ছোরা নিক্ষেপ করছে না অন্য কোনো উদ্দেশ্যে.....

হাঁ, ছোরা নিক্ষেপকারী, কোনো উদ্দেশ্য আছে। কথাগুলো বলে বনহুর নরকংকালটার দিকে তাকালো।

রহমান বললো–সর্দার, ঐ ছোরা নিক্ষেপকারীই এই মানুষগুলোকে হত্যা করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হতে পারে...বনহুর কথা বলতে গিয়ে থেমে পড়লো। কারণ হঠাৎ একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো তার পাশে মাটিতে।

বনহুর ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে এবং তাকালো যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছে সেইদিকে। বনহুরের চোখেমুখে একটা উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠলো। বললো সে-রহমান, ছোরা নিক্ষেপ কারী আমাদের কোনো ইংগিত দিচ্ছে বলে আমার ধারণা। কিন্তু আমরা তা বুঝে উঠতে পারছি না।

মনিরা বললো–আবার তোমার সেই অজ্ঞাত নারীর আবির্ভাব ঘটেনি তো? হয়তো বা সে তোমার সন্ধানে এই অজানা অচেনা দ্বীপেও এসে হাজির হয়েছে।

তোমার ধারণা সত্যও হতে পারে মনিরা। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি। ছোরাগুলো একালের নয়। বহুদিনের পুরোন, মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। বনহুর তার পাশে গেঁথে থাকা ছোরাখানা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো। এসব ছোরা আজ কালকার নয় রহমান, বহু বছর আগের।

রহমান এবং মাহবুব ছোরাখানা হাতে নিয়ে দেখতে লাগলো। সত্যি এ সব ছোরা এ যুগের নয়, বহু পূর্বের। যদিও মরচে ধরে ক্ষয় হয়ে গেছে তবুও খুব সূতী এবং মজবুত।

ক্রমে সব যেন কেমন রহস্যময় হয়ে আসছে। যত এগুচ্ছে তারা ততই বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছে। একদিকে অজ্ঞাত ব্যক্তির নিক্ষিপ্ত ছোরা, আরেকদিকে চারিদিকে ছড়িয়ে শুধু সোনা সোনা আর সোনা।

আবার তারা চলতে লাগলো।

চারদিকে শুধু মাটি আর সোনা, আবছা অন্ধকারে সোনার দানাগুলো ঝলমল করছে।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠলো।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো মনিরা-চলো এবার ফিরে চলো, আর এগিয়ে কাজ নেই।

মনিরা এসেছি যখন তখন ফিরে যেতে রাজি নই। যে মাথুন বিশ্বের মানুষের কাছে চিরঅজ্ঞাত আমি সেই মাথুনের রহস্য উদঘাটন না করে ফিরবো না।

কি চাও তুমি? সোনা! কত সোনা নেবে নিয়ে তবু ফিরে চলল। বড় ভয় করছে আমার। ছোরা নিক্ষেপকারী কোন্ সময় তোমাকে লক্ষ্য করে…না না, আমি তা সহ্য করতে পারবো না। ঐ যে নরকংকাল দুটো দেখলাম ওগুলো সব এই ছোরা নিক্ষেপকারীই হত্যা করেছে।

বললো রহমান—হাঁ সর্দার, বৌরাণী যা বলরেন তা ঠিক, ছোরা নিক্ষেপকারীই এসব হত্যা করেছে।

সঠিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। রহমান, তোমরা শুকনো কাঠ সংগ্রহ করো। রাতের মত এখানেই আমরা আশ্রয় নেবো।

আচ্ছা সর্দার। বললো রহমান।

আরও দু'জন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে রহমান ও মাহবুব শুকনো কাঠ সংগ্রহের জন্য পা। বাড়ালো।

মনিরা বললো–আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।

ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই মনিরা! তাজ যদি আমার পাশে থাকতো তাহলে তোমাকে আমার ডুবুজাহাজে পৌঁছে দিয়ে আসতাম।

উঃ! কি কঠিন মন তোমার! আমাকে ডুবুজাহাজে সাগরের গভীর জলরাশির তলায় রেখে তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে আসতে। তোমার একটুও মায়া-মমতা নেই।

কবেই বা মায়া-মমতা দেখেছো আমার মধ্যে! আমি তো অমানুষ-এটা তোমারই দেওয়া উপাধি।

আমি কি সে কথা অন্তর থেকে বলেছিলাম? তুমি যে মানুষ এবং খাঁটি মানুষ তা আমি সবার চেয়ে ভাল জানি। তবে মাঝে মাঝে তুমি অমানুষের চেয়েও ভয়ংকর হয়ে ওঠো।

এসো মনিরা, আমরা ঐ ফাঁকা জায়গাটায় বসি গিয়ে। রহমান আর মাহবুব এসে পড়লেই আগুন জ্বালানো হবে। পকেট থেকে ক্ষুদে ওয়্যারলেসটা বের করে মুখের কাছে। ধরলো, তারপর ডুবুজাহাজের চালক জনের সঙ্গে কিছু কথা বললো বনহুর।

বনহুর আর মনিরা বসে আছে পাশাপাশি।

বললো মনিরা-দেখো কেমন জমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে চারদিকে।

হাঁ।

যদি কোনো হিংস্র জীবজন্তু আক্রমণ করে?

জানতাম এই দ্বীপে কোনো প্রাণী নেই কিন্তু এসে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে আমার ধারণা পাল্টে গেছে। মনিরা, হিংস্র জীবজন্তুর জন্য আমি ভয় পাই না। হিংস্র জীবজন্তুর চেয়েও হিংস্র হলো মানুষ।

সত্যি বলেছো তুমি। ছোরা নিক্ষেপকারী নিশ্চয়ই জন্তু নয়-মানুষ।

যদি কোনো হামলা হয় তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি মনিরা। ঐ যে রহমান আর মাহবুব কাঠ নিয়ে এসে গেছে।

রহমান ও মাহবুব এবং তাদের সঙ্গীরা পিঠে শুকনো কাঠের বোঝা নিয়ে হাজির হলো।

এসে তারা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলো। বনহুর, মনিরা এবং তাদের সঙ্গী-সাথী সবাই বিশ্রামের জন্য অগ্নিকুন্ডটা ঘিরে বসলো।

তাদের সঙ্গে খাবার এবং পানি ছিলো।

সবাই মিলে খাবার খেতে শুরু করলো। বনহুর খেতে খেতে বললো–হমান, এই দ্বীপে পূর্বে কোনো মানুষের পদক্ষেপ না পড়লেও এখন এখানে এমন কোনো মানুষের দলের আগমন হয়েছে যারা নরমাংস খায়...একটু থেমে বললো সে-শুধু তাই নয়, তারা সভ্যও বটে, তার পরিমাণ সিগারেটের টুকরাটি। মূল্যবান সিগারেট-এসব সিগারেট এ যুগের লোকেরাই পান করে। তাছাড়া দেখেছি কমলালেবুর খোসা।

সর্দার, সব যেন কেমন এলোমেলো লাগছে।

সব কিছুর সমাধানও হবে রহমান। তবে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। আমি জানি হয়তো। বা আমাদের জীবনও বিপন্ন হতে পারে...

বনহুরের কথা শেষ হয় না, মনিরা বলে উঠলো–ফিরে চলো। আমি চাই না সোনাদানা, মাথুন দ্বীপের ঐশ্বর্য নিতে। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

মনিরা, তুমি না বল আমি পাশে থাকলে তোমার কোনো চিন্তা নেই? এই তো আমি তোমার পাশে আছি। এ ছাড়া রহমান, মাহবুব আর অন্যরাও আছে। আর আছেন দয়াময় যিনি সর্বক্ষণ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে চলেছেন।

সে রাত কেটে গেলো।

আবার শুরু হলো বনহুরের দলবলের চলার পালা। বনহুর সবসময় মনিরার পাশে পাশে চলেছে। গহন জঙ্গল, হঠাৎ কোনো বিপদ না এসে পড়ে তাই বনহুর ও তার দলবল মনিরার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে-তার শরীরে যেন একটা কাঁটার আঁচড়ও না লাগতে পারে।

অনেক পথ এগিয়ে এলো ওরা।

তাদের সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র ছিলো। শুকনো খাবার, মাখন রুটি, হালুয়া, পানীয়। এ ছাড়াও রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, বারুদ, ছোরা, ওয়ারলেস মেশিন, ক্যামেরা ইত্যাদি।

রহমান সবার আগে আগে চলেছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো রহমান।

সবাই অবাক হয়ে দেখলো একটা ছোরা এসে বিদ্ধ হলো তাদের সামনে।

কোথা থেকে ছোরা এলো, কে ছোরা নিক্ষেপ করছে কিছুই বুঝতে পারলো না কেউ। সকলে অবাক, বিস্মিত হতবাক। এখনও তাহলে ছোরা নিক্ষেপকারী তাদের অনুসরণ করে চলেছে।

বনহুর ছোরাখানা তুলে নিয়ে দেখলো। একই ধরনের ছোরা যা ইতিপূর্বে কয়েকবার তাদের আশেপাশে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো-রহমান বললো, সর্দার আমরা যখন রাতে অগ্নিকুন্ড জেলে বিশ্রাম করছিলাম তখন ঐ ছোরা নিক্ষেপকারী অনায়াসে আমাদের ছোরা বিদ্ধ করতে পারতো।

হাঁ পারতো। তাই মনে হয় সে আমাদের হত্যা করতে চায় না।

তাহলে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে সেই ছোরা নিক্ষেপকারীর ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সর্দার উদ্দেশ্য ছাড়া তো কেউ কিছু করে না।

হাঁ, ছোরা নিক্ষেপকারীর যে কোনো একটা উদ্দেশ্য আছে তাতে কোনো ভুল নেই। চলো আমরা এগুতে থাকি।

ছোরাখানা রহমানের হাতে দিয়ে বনহুর পা বাড়ালো।

তার সঙ্গীসাথীরা তাকে অনুসরণ করলো।

যতই এগুচ্ছে ততই বিস্ময় ফুটে উঠছে সবার চোখেমুখে। চার দিকে মাটি আর সোনা। সূর্যের আলোতে সোনার কুচিগুলো মণি মাণিক্যের মত চকচক করছে।

*

যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বিস্ময় জাগছে বনহুরের মনে। কিছুদূর এগুনোর পর তারা আবার একটি নরকংকাল দেখতে পেলো। একই ধরনের নরকংকালটি, কেউ যেন মৃত ব্যক্তির দেহের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছে।

বনহুরের মনে সন্দেহ জাগালো, নানা ধরনের চিন্তার উদ্ভব হচ্ছে তার মনে। মনিরা এবং অনুচররা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ করে বুঝতে পারলো তাদের সর্দার কোনো এক ভয়ংকর মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

কয়েকজন মাত্র তারা, যদি তেমন কোনো ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলেও মোকাবেলা করতে হবে। সর্দার মুখে না বললেও তারা বেশ উপলব্ধি করলো।

কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না বনহুরকে।

শুধু মনিরা স্বামীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরলো।

বনহুর বললো–বিচলিত হয়োনা মনিরা।

বনহুরের কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ় ভাব প্রকাশ পেলো যা মনিরা এবং দলবলকে। অনেকটা আশ্বস্ত করলো।

ক্রমে সন্ধার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগলো।

গভীর জঙ্গল।

চারদিকে জমাট অন্ধকার নেমে আসছে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো মনিরা-আর এগুনো উচিত হবে না। চলো ফিরে যাই আমাদের ডুবুজাহাজে।

রহমান কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

বনহুর বললো–এখান থেকে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় মনিরা। কারণ আমরা এখন গহন জঙ্গলের মাঝামাঝি এসে পড়েছি আজ রাতে আমরা এই জঙ্গলেই আশ্রয় নেবো। একটু থেমে বললো বনহুর–মনে রেখো অজ্ঞাতে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে। যদি সে আমাদের মঙ্গলকামী হয় তবে আমরা নিরাপদে রাত যাপন করতে পারবো। আর যদি অনুসরণকারী আমাদের শত্রু হয় তা হলে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

রহমান বললো–সর্দার, কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা দরকার।

কেন?

আগুন জ্বালাতে হবে। হিংস্র জীবজন্তুর কবল থেকে....

একটু হেসে বললো বনহুর–আমি জানতাম এ দ্বীপে কোনোদিন কোনো হিংস্র জীবজন্তু নেই। আরও জানতাম কোনো প্রাণীই এ দ্বীপে কোনো সময় অবস্থান করতে সক্ষম নয় কিন্তু…বনহুর কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো এবং রহমান ও অন্যান্য অনুচরকে লক্ষ্য করে বললো–যাও তোমরা আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করো। কারণ এক সময় এ দ্বীপে কোনো প্রাণী না থাকলেও এখন যে আছে তাতে কোনো ভুল নেই। আমরা যে ছোরাগুলো পেলাম তা কোনো মানুষের উপস্থিতির লক্ষণ।

মনিরা বললো–যাও রহমান, আগুন জ্বালার ব্যবস্থা করো।

আমার কিন্তু বড় ভাল লাগছে না। চারদিকে ছড়ানো মানুষের কংকাল। কে জানে। আমাদের ভাগ্যে কি আছে।

রহমান বললো–আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বৌরাণী। আমরা থাকতে আপনার কোনো ভয় নেই। তা ছাড়া সর্দার রয়েছেন আপনার পাশে।

মনিরা রহমানের কথায় স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। ঝাপসা অন্ধকারে একটা ভরসাস্থলের আশ্রয় যেন তার মনকে সতেজ করে তুললো। সে তো বহুদিন ভেবেছে যত বিপদ সব সে মাথা পেতে নেবে যদি তার পাশে থাকে তার মনির। আজ তার পাশে মনির, তার একান্ত আপনজন। তার কামনা বাসনার জন….

কি ভাবছো মনিরা?

কিছু না।

স্বামীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় মনিরা। বললো সে-গহন জঙ্গল কিন্তু কোনো জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নেই। সত্যি বড় আশ্চর্য লাগছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝঝুম…

এতক্ষণে আমরা ভাল জায়গা বেছে নেই, এসো মনিরা।

এখান থেকে বেশি সরে যাওয়া ঠিক হবে না। ওরা ফিরে এসে যদি আমাদের না দেখতে পায় তাহলে…

আমরা দূরে যাবো না মনিরা।

এ জায়গা মন্দ নয়। বললো মনিরা।

রহমান আর তার সঙ্গীরা শুকনো কাঠ সংগ্রহে ব্যস্ত, তাদের কাঠ কাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মনিরা বললো–অনেক হেঁটেছি, এসো বসি।

বনহুর আর মনিরা পাশাপাশি বসলো।

সন্ধ্যার অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে আসছে। মনিরার হাতের মুঠায় বনহুরের বলিষ্ঠ হাতখানা। এক অপূর্ব অনুভূতি জাগলো মনিরার মনে। এমনি করে চিরদিন যদি সে স্বামীর পাশে থাকতে পারতো তাহলে বেহেস্তের সুখ অন্তরে অনুভব করতো। স্বামীকে সে বহুবার একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছে কিন্তু সে যেন অমূল্য রত্নের মত, সর্বদা একটা হারানোর দুর্বলতা তার মনকে ভীরু কপোতর মত করে রেখেছে। পেয়েও না পাওয়ার একটা দুশ্চিন্তার ছায়া মনিরার হৃদয়কে ব্যথিত, কাতর করে রাখে সর্বক্ষণ।

এত বিপদেও মনিরা অবিচলিত, আল্লাহ তার ভরসা। আর স্বামী তার পাশে রয়েছে। সব বিপদকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে প্রস্তুত সে।

ফিরে এলো রহমান তার সঙ্গীদের নিয়ে।

অল্পক্ষণে অনেক শুকনো কাঠ তারা সংগ্রহ করেছে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার গোটা বনভূমি অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলেছে তবুও তারা অল্প চেষ্টাতেই আগুন জ্বালাতে সক্ষম হলো।

বনহুর আর তার দলবল অগ্নিকুন্ডটার চারপাশ ঘিরে বসলো।

মনিরা চিরকাল শহরে মানুষ হয়েছে। বনজঙ্গলের সঙ্গে তার তেমন পরিচয় ছিলো না। স্বামীর সঙ্গলাভে তার জীবনে এসেছে নানা রকম পরিবেশ। নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে আর এখনও হচ্ছে। কত ভয়ংকর মুহূর্তের সঙ্গে তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম মনিরা ভীত আতঙ্কিত হতো, এখন তার তেমন ভয় করে না। এই বয়সে তার জীবনে এসেছে নানা ঝড়ঝঞ্ঝা।

তবুও মনিরা বিচলিত নয়, তার স্বামীর জন্য সে সবকিছু মাথা পেতে গ্রহণ করতে পারে। আজ এ পরিবেশে তার মনে ভীতি ভাব জাগলেও একটা সাহস তার সমস্ত মনকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এমন রাত তার জীবনে বহুবার এসেছে, জয়ী হয়েছে সে নানা বিপদের মধ্য দিয়ে। মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক কথা।

রহমান দলবলসহ শুকনো কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালালো।

সংখ্যায় তারা খুব বেশি নয়, তাই সবাই মিলে কাছাকাছি গোল হয়ে বসলো।

সঙ্গেই খাবার এবং পানি ছিলো। আগুন জ্বালার পর বনহুর তাদের খাবারের আয়োজন করতে বললো।

বনহুর আর মনিরা একই পাত্রে খাবার তুলে নিলো আর বনহুরের অনুচরগণ একটা পাত্রে নিয়ে সবাই মিলে খেতে শুরু করলো। অনেকটা পথ তারা হেঁটেছে, কাজেই সবাই ক্লান্ত। অগ্নিকুন্ডের আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠেছে।

মনিরা জানে তার স্বামী অন্যান্য খাবারের চেয়ে ফল খেতে ভালবাসে। তাই ফলগুলো বনহুরের হাতে তুলে দিচ্ছিলো। বনহুর আবার মনিরার মুখে তুলে দিয়ে হেসে বললো–তুমি সব তো আমাকেই খাওয়াচ্ছো মনিরা। তুমি কিন্তু কিছু খাচ্ছো না।

এই তো খাচ্ছি। বললো মনিরা।

অগ্নিকুন্ডের দীপ্ত আলোতে মনিরা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো।

মনিরা অনেকদিন স্বামীর মুখে এমন হাসি দেখেনি, বড় ভাল লাগলো তার, অপলক চোখে তাকিয়ে লজ্জায় মাথাটা নত করে নিলো, কারণ তাদের চারপাশে রহমান, মাহবুব এবং আরও অন্যান্য অনুচর রয়েছে। কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলো মনিরা।

রহমান মনিরার লজ্জিত ভাব লক্ষ করে পাশ ফিরে বসলো।

খাওয়ার পর্ব শেষ হলো।

যে যার চাদর বিছিয়ে ঘুমাবার আয়োজন করে নিলো।

বনহুর আর মনিরা একপাশে নিজেদের বিশ্রামের আয়োজন করলো।

বললো বনহুর—মনিরা, তুমি ঘুমোও, আমি জেগে আছি!

সত্যিই মনিরার দু'চোখ ক্লান্তিতে মুদে আসছিলো, বনহুরের কথায় সে তার পাশে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়লো।

রাত বাড়ছে।

রহমান এবং অন্যান্য সবাই ঝিমুতে শুরু করলো।

সকলের চোখেই ঘুম জড়িয়ে আসছে।

কত দিন পর তারা আজ নিরিবিলি বিশ্রাম গ্রহণ করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। শুধু জেগে আছে বনহুর। মনিরা তার পাশে হাতের ওপর মাথা রেখে কাৎ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার তাকিয়ে দেখলো বনহুর মনিরা সুখনিদ্রায় বিভোর, বেচারী অনেক হেঁটেছে, কোনোদিন এতটা পথ একনাগাড়ে হটেনি। বনহুরের মনে অনেক কথা উঁকি দিচ্ছে। আজ মনিরা গভীর জঙ্গলে তৃণশয্যায় শয়ন করে আছে। তার জন্য সে আজ এত দুঃখ-ব্যথার সম্মুখীন হয়েছে। মনে পড়ে আজ বনহুরের প্রথম সাক্ষাতের কথা…দস্যুতা করতে গিয়ে দেখেছিলো বনহুর নতুন একমুখ কিন্তু তার গলার লকেটের ছবি তাকে বিস্মিত হতবাক করেছিলো সেদিন। যেমন একটি লকেট বনহুর নিজের গলায় দেখতে পেয়েছে তেমনি একটি লকেট ছিলো মনিরার গলায়। লকেটের তরুণীটি কি তার গলার লকেটের ফুটফুটে সুন্দর স্নিগ্ধ সেই ছোট্ট মেয়েটি? একটা অজ্ঞাত আকর্ষণ তাকে অভিভূত করে ফেলেছিলো। বড় ভাল লেগেছিলো সেদিন তাকে ওর।

হীরার আংটি হরণ করতে গিয়ে বিফল হয়ে ফিরে এসেছিলো বনহুর সেদিন। মহামূল্য হীরার আংটির জন্য সে চৌধুরী বাড়িতে গিয়েছিলো এবং মনিরার কক্ষে প্রবেশ করেছিলো। অতি সহজেই আংটিটা খুলে নিতে পারতো এবং অনায়াসে সরে আসতে পারতো কিন্তু সেদিন বনহুর তা পারেনি এবং তার মনে একটা গভীর অনুভূতি অনুভব করেছিলো, এই কি সে যার ছবি তার গলার চেইনে রয়েছে।

সেদিনের মনিরা আর আজকের মনিরা কত তফাৎ। অবশ্য মনিরার মধ্যে খুব একটা পরিবর্তন আসেনি এখনও। প্রথম থেকেই মনিরা শান্ত ধীরস্থির, আজও তাই। কোনোদিন সে চঞ্চল ছিলো না। একটা সুন্দর পবিত্র মুখের প্রতিচ্ছবি মনিরা। আর নূরী! চঞ্চলা হরিণীর মত, উজ্জ্বল ঝরণার মত। বনহুরকে ভালবাসে নুরী, ছোট বেলার সাথী তার সে, সরলা একটি বন্যকন্যা। নূরী জীবন দিয়ে বনহুরকে পেতে চেয়েছিলো, পেয়েছে। বনহুর নূরীর ত্যাগকে অভিনন্দন জানায়, নূর কোনোদিন বনহুরের কোনো ইচ্ছায় বাধ সাধেনি। আর মনিরা সব সময় চেয়েছে তার স্বামী পাশে থাকবে, সংসারী হবে, দস্যুতা করবে না। বনহুরের জীবনে এসেছে দুটি নারী-মনিরা আর নূরী। বনহুর কোনোদিন চায়নি নূরীকে সে বিয়ে করে আপন করে নেবে। নূরীকে তার ভাল লাগতো খেলার সাথী হিসেবে, তাই বনহুর কোনোদিন নূরীকে নিয়ে ভাবেনি গভীরভাবে। তারপর ভাগ্যক্রমে নুরী এলো তার সঙ্গিনী হয়ে, তখনও বনহুর তাকে ভাল বাসত কিনা সে নিজেই অনুধাবন করতে পারেনি।

রহমান তার মনে নতুন এক উম্মাদনা সৃষ্টি করেছিলো। আজও ভোলনি বনহুর রহমানের সেদিনের কথাটি...সর্দার নূরীকে গ্রহণ করা আপনার পূরম কর্তব্য, কারণ আপনার বাপুজী কালু খাঁর বড় সাধ ছিলো আপনার সঙ্গে নূরীর বিয়ে দেবে। যে আশা তার মনের গহনে জাগতো সে আশা আপনি অবহেলায় দূরে ঠেলে দেবেন না।

বনহুর সেদিন দেখেছিলো কালু খাঁর মুখের প্রতিচ্ছবিটি। শুনতে পেয়েছিলো তার কণ্ঠের গম্ভীর কণ্ঠস্বর, বনহুর রহমান যা বলছে তা সত্য...আমি যা চেয়েছিলাম তা সমাপন করে আসতে পারিনি...তুমি নূরীকে অবহেলা করো না... সে তোমাকে ভালবাসে...স্বামী হিসাবে তোমাকে সে কামনা করে...তুমি তাকে বিয়ে করো

কালু খাঁর সেই অদৃশ্য কণ্ঠস্বর তাকে সম্মতি দান করতে বাধ্য করেছিলো সেদিন। মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে আজ এই মাথুন দ্বীপের গভীর জঙ্গলে বসে মনে পড়ছিলো নূরীর মুখখানা।

হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর–তার পায়ের কাছে একখানা ছোরা এসে গেথে গেলো।

বনহুর দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে ছোরাখানা এসেছিলো সেইদিকে দৌড়ে গেলো। যাবার সময় পাশে রাখা রিভলভারখানা হাতে তুলে নিলো সে দ্রুতগতিতে।

বনহুর অন্ধকারেও ভালো দেখতে পেতো, কারণ আজীবন তার বনজঙ্গলে কেটেছে। বনের পশুরা যেমন দেখতে পায় তেমনি দৃষ্টি শক্তি ছিলো বনহুরের চোখে। বনহুর অতি দ্রুত ছুটে গেলো, তাকে দেখতেই হবে কে এই ছোরা নিক্ষেপকারী। তার দক্ষিণ হাতে উদ্যত রিভলভার।

ভীষণ আর ভয়ংকর একটা মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত ছিলো বনহুর। ছোরা নিক্ষেপকারী কাউকে হত্যার উদ্দেশ্যে ছোরা নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু কি তার উদ্দেশ্য? বনহুর তা জানতে চায়। আরও একটা বিষয়ে জানার বাসনা তাকে উম্মাদ করে তুলেছে, মাথুন দ্বীপে কি করে মানুষ এলো মানুষ ছাড়া তো ছোরা কেউ নিক্ষেপ করতে পারে না এবং ছোরা নিক্ষেপকারী যে একজন অত্যন্ত সতর্ক ব্যক্তি তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর দ্রুত দৌড়ে আসতেই অদুরস্থ বৃক্ষশাখা দুলে উঠলো। কেউ যেন এক বৃক্ষ থেকে অপর বৃক্ষের ডাল ধরে সরে পড়লো। বনহুর ভালোভাবে লক্ষ্য করে আবার দৌড়ে গেলো সেদিকে।

ছোরা নিক্ষেপকারী অপর বৃক্ষ হতে পুনরায় আর একটি বৃক্ষের ডালে ঝুলে পড়লো, তারপর গহন জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে এগুতে লাগলো।

কিন্তু বনহুরের দৃষ্টি এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হলো না। বনহুর এবার একটি গুলি ছুড়লো। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা বনহুরের উদ্দেশ্য নয়।

আরও দ্রুত ছুটছে ছোরা নিক্ষেপকারী।

বনজঙ্গল দুলে দুলে উঠছে এলোপাতাড়ি। ছুটছে ছোরা নিক্ষেপকারী।

এদিকে রিভলভারের গুলীর শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে রহমান ও অন্যান্য অনুচরের। মনিরার ঘুমও ভেঙে গেলো। সবাই দৌড়াতে শুরু করলো যেদিক থেকে গুলীর শব্দ এসেছিলো সেইদিকে।

মনিরা অন্ধকারে পথ চলতে অভ্যস্ত নয়। স্বামীর হাত ধরে সে এসেছে এতটা পথ কিন্তু এখন সে নিজকে বড় অসহায় মনে করছে! গুলীর শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় চমকে উঠে বসেই অবাক হয়। পাশে তার স্বামী নেই, সঙ্গীসাথীরা সবাই এলোমেলো বিক্ষিপ্তভাবে ছুটছে। ব্যাপারখানা কি বুঝতে পারে না মনিরা। তবুও সে ওদের পেছনে এগুতে লাগলো।

জমাট অন্ধকারে কে কোন্ দিকে গেছে বুঝতে পারে না মনিরা। সে পুনরায় ফিরে আসে সেই স্থানে অগ্নিকুন্ডটির পাশে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার সামনে এসে দাঁড়ায় এক তরুণ। তার হাতের দু'পাশে কয়েকখানা ছোরা বাধা রয়েছে। মনিরা চিৎকার করতে যাবে অমনি তরুণ তার মুখ চেপে ধরলো।

চিৎকার করতে পারে না মনিরা, বলিষ্ঠ হাতখানা তার বাকরুদ্ধ করে দেয়। অগ্নিকুন্ডের ঝাপসা আলোতে তরুণকে দেখে মনিরা চমকে উঠলো। এ মুখ যে তার স্বামীর মুখের সঙ্গে হুবহু মিল আছে। সেই দীপ্ত বলিষ্ঠ চেহারা। প্রশস্ত বক্ষ, বাজুতে কয়েকখানা ছোরা বাধা রয়েছে। কে এই তরুণ যার চেহারা শুধু তার স্বামীর সঙ্গেই মিলে যাচ্ছে তা নয়, নুরের চেহারার সঙ্গেও মিল রয়েছে। অতি দ্রুত মনিরা ভেবে চলেছে। তরুণ মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো–আমার সঙ্গে এসো....।

মনিরা অবাক হলো, তরুণ বেশ সুন্দর বাংলায় কথা বললো। সব যেন অবাক লাগছে, মনিরা কোনো কথা না বলে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো।

তরুণ বললো–আমাকে ভয় করোনা! আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। এসো তাড়াতাড়ি..

না, আমি তোমার সঙ্গে যাবো না। কে তুমি?

তোমার সব কথার জবাব দেওয়া যাবে না। তুমি এসো, না হলে ওরা আবার এসে পড়বে।

তোমাকে আমি চিনি না। এই গহন জঙ্গলে আমি তোমার সঙ্গে যাবে না। বলো কে তুমি?

ঠিক ঐ মুহূর্তে শোনা গেলো দ্রুত পদশব্দ।

মনিরা বললো–এবার ওরা এসে পড়লো। তুমিই সেই ছোরা নিক্ষেপকারী! তোমাকে আমার স্বামী ক্ষমা করবে না কিছুতেই।

ছোরা নিক্ষেপকারী কোনো কথা না বলে মনিরাকে অতি সহজে তুলে নিলো কাঁধে।

মনিরা চিৎকার করতে গেলো কিন্তু কোনো শব্দ তার গলা দিয়ে বের হলো না। ভয়ে আরষ্ট হয়ে গেছে সে। হঠাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো মনিরা।

ছোরা নিক্ষেপকারী মুহূর্ত বিলম্ব না করে সরে পড়লো সেখান থেকে।

বনহুর অনুচরদের নিয়ে ফিরে এলো অগ্নিকুন্ডটার পাশে। কিন্তু একি! মনিরা কোথায়? চমকে উঠলো বনহুর। সে ভেবেছিলো মনিরা তার জায়গায়ই রয়েছে।

রহমান ও অন্যান্য অনুচরও আরষ্ট হয়ে গেলো, কারণ তারা গুলীর শব্দ শুনে দিশেহারার মত দৌড়ে গিয়েছিলো, মনিরার সম্বন্ধে তারা গভীরভাবে চিন্তা করেনি। মনিরা তার জায়গায় নেই, তবে সেও কি তাদের পেছনে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছিলো?

সবাইকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বনহুর ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো–দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছো! যাও মনিরাকে খুঁজে বের করো। নিশ্চয়ই সে এই বনের মধ্যে আমাদের সন্ধান করে ফিরছে।

সর্দার মাফ করবেন, আমরা অপরাধী। আপনার রিভলভারের গুলীর আওয়াজ পেয়ে সবাই ছুটে গিয়েছিলাম। বৌরাণী যে আমাদের সঙ্গে ছিলো এ কথা আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলাম। কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বললো রহমান।

বনহুর বললো–তোমাদের খেয়াল করা উচিত ছিলো। এসো আমার সঙ্গে। নিশ্চয়ই একা একা গহন বনে আমাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে। বনহুর অনুচরদের নিয়ে এগুতে লাগলো।

অনেক দূর পর্যন্ত সন্ধান চালিয়েও মনিরাকে তারা খুঁজে পেলো না। রহমান চিৎকার করে ডাকলো-বৌ রাণী... বৌ রাণী...বৌ রাণী...

প্রতিধ্বনি ফিরে এলো কিন্তু কোনো কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেলো না।

সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে খুঁজলো ওরা। কিন্তু মনিরাকে পেলো না।

এক সময় রাত ভোর হয়ে এলো।

বনহুর আর তার অনুচরগণ ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে একটা ঝোঁপের পাশে বসে পড়লো। সবার মুখেই বিষণ্নতার ছাপ।

মাহবুব বললো–সর্দার, বৌরাণী ভাল আছে আমার মন বলছে। তার কোনো ক্ষতি হয়নি।

বনহুর বললো–জানি না সে এখন জীবিত আছে কিনা। কারণ এই মাথুন দ্বীপে এমন কোনো জীব বাস করে যার দাঁত এবং নখের আঘাতে যে কেউ নিহত হয় এবং এই জীব তার মাংস খায়। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

হঠাৎ বনহুরের একজন অনুচর বলে উঠলো–সর্দার ঐ দেখুন ঝোঁপের কাটায় ছেঁড়া কাপড়ের একটি টুকরা ঝুলে রয়েছে।

বনহুর এবং রহমান দ্রুত উঠে গেলো সেখানে।

সঙ্গী-সাথীরাও তাদের পেছনে পেছনে ঝোঁপটার পাশে এসে দাঁড়ালো! সবার চোখেমুখে ভীষণ একটা আগ্রহ আর উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

রহমান কাঁটাগাছ থেকে কাপড়ের টুকরাটি খুলে নিতে নিতে বললো–সর্দার, এই কাপড়ের টুকরা বৌরাণীর কাপড়ের আঁচলের অংশ…

বনহুর টুকরাটা হাতে নিয়ে ভালভাবে লক্ষ করে বললো–হাঁ রহমান সত্য, এটা মনিরার কাপড়ের আঁচলের অংশ। তবে কি মনিরাকে কেউ ধরে নিয়ে গেছে? মনিরাকে কি হত্যা করা হয়েছে।

চলুন সর্দার, আমরা এদিকে বৌরাণীর সন্ধান করি। কথাটা রহমান বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো।

বনহুরের চোখ দুটোও অশ্রু ছল ছল হয়ে এলো। তার মনে দারুণ আঘাত লাগলো, তবে কি সত্যি মাথুন দ্বীপে মনিরাকে রেখে তাদের ফিরে যেতে হবে। মনিরার মুখখানা বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, ফিরে গিয়ে নূর আর

মাকে কি বলে সান্তনা দেবে। মনিরা যে মায়ের কত আদরের তা জানে বনহুর। মায়ের সেবাযত্ন সব মনিরা নিজের হাতে করে বনহুর তা ভাল ভাবেই জানে আর জানে বলেই এতো ভাবনা।

সর্দারকে ভাবতে দেখে বলে মাহবুব-সর্দার চলুন আর দেরী করা ঠিক হবে না।

হাঁ চল। বলে বনহুর আর তার দলবল এগুতে লাগলো।

সন্ধান করে চললো তারা মনিরার।

*

ক্যাপটেন আরফিন হুই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন, ললাটে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। বললেন তিনি-মা লুসি, ঐ দেখো জাভেদ ফিরে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য, ওর কাঁধে একটি নারীদেহ রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই-এর কথায় মিস লুসি এবং ফুল্লরা ও অন্য সবাই তাকালো পর্বতমালার পাদদেশের দিকে। তারা দেখতে পেলো জাভেদ এগিয়ে আসছে, তার কাঁধে একটি মহিলা।

সকলের চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। সম্পূর্ণ দুটি দিন কেটে গেছে জাভেদের কোনো সন্ধান তারা পায়নি। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে সে চলে গিয়েছিলো। কোথায় গিয়েছে তা তারা কেউই জানতো না। এমন কি ফুল্লরাকেও জাভেদ কিছু বলে যায়নি।

ক্যাপ্টেন আরফিন হুই-এর প্রচেষ্টা বিফল হয়েছে। ডঃ ডাওনা লর্ডের ডায়রীর সেই গুপ্ত গুহা খুঁজে বের করতে সক্ষম হননি তিনি। অনেক সন্ধান করেছেন তবুও বিফল হলেন। অগত্যা ক্যাপ্টেন হুই তার দলবল নিয়ে জাহাজে ফিরে যাবেন এ চিন্তা করছিলেন। এই ক’দিনে প্রচুর স্বর্ণকণা সংগ্রহ করেছেন তিনি। মাথুন দ্বীপ তাকে অনেক দিয়েছে। কিন্তু তবু তার দুঃখ মাথুন দ্বীপে তিনি হারিয়েছেন বেশ কয়েকজন সঙ্গী-সাথীকে। নরখাদক ডঃ ডাওনা লর্ড তাদের হত্যা করে ফেলেছে। আর কোনোদিন তাদের ফিরে পাবেন না। যখন ক্যাপ্টেন হুই স্বদেশে ফেরার চিন্তায় মগ্ন তখন হঠাৎ একদিন জাভেদ কাউকে কোনো কিছু না জানিয়ে হুট করে উধাও। সে গেলো কোথায়! অনেক সন্ধান করেও যখন জাভেদের খোঁজ পাওয়া গেলো না, তখন সবার মনে একটা ভীষণ আতঙ্ক দেখা

দিলো। তবে কি কেউ জাভেদকে সরিয়ে ফেলেছে? ফুল্লরার সন্দেহ ডিরোমা জাভেদকে হত্যা করেছে। জাভেদ যেদিন থেকে উধাও হয়েছে সেদিন থেকে ডিরোমাকে বেশ হাস্যোজ্জ্বল মনে হচ্ছে। তবে কি সেই তাকে হত্যা করেছে!

ফুল্লরার মনে দারুণ একটা সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিলো। আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছিলো সে। লুসি অনেক সান্তনা দিয়েও তাকে শান্ত করতে পারেনি। আজ হঠাৎ যখন পিতৃ সমতুল্য ক্যাপ্টেন হুই এর-মুখে শুনতে পেলো ঐ তো জাভেদ এসেছে, তখন সবার চেয়ে বেশি খুশি, হয়েছে ফুল্লরা। তার দু'চোখে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ঝরে পড়েছে। আর কেউ লক্ষ না করলেও তা মিস লুসির চোখ এড়ালো না।

ছুটে এলো লুসি ফুরাকে নিয়ে। অন্যান্য যারা ছিলো তারাও এসে দাঁড়ালো। সবাই তাকিয়ে আছে, দেখছে জাভেদ পর্বত মালার গা বেয়ে উপরে উঠে আসছে। তার কাঁধে কাউকে দেখা যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জাভেদ নিকটে এসে পড়লো।

যে স্থানে নরখাদকটিকে ক্যাপ্টেন হুই-এর নির্দেশে কবরস্থ করা হয়েছে ঐ স্থানে এসে দাঁড়ালো জাভেদ। তার কাঁধে একটি সংজ্ঞাহীন নারী। সকলের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

ক্যাপ্টেন হুই জিজ্ঞাসা করলেন-জাভেদ, কে এই মহিলা? জীবিত না মৃত

জাভেদ মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা নামিয়ে শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তারপর বললো–আমি একে চিনি না, তবে আমার বাপুর সঙ্গে ওকে দেখেছি। তাই তুলে নিয়ে এলাম…

ফুল্লরা নিশ্চুপ অবাক হয়ে দেখছিলো, জাভেদের মুখে বাপু কথাটা শুনে অবাক হয়ে বলে উঠলো–জাভেদ, তোমার বাপু কোথায় তাকে কোথায় দেখলে তুমি?

জাভেদ বললো–এই দ্বীপে বাপু এসেছে। এই মহিলাটি আমার বাপুর সঙ্গে ছিলো। আমি ধরে নিয়ে এসেছি একে।

ক্যাপ্টেন হুই-এর বিস্ময় ক্রমে বাড়ছে-কে তার বাপু? আর এই দ্বীপেই বা এ মহিলাটি এলো কি করে? বললেন ক্যাপ্টেন হুই-জাভেদ, কে তোমার বাপু, আর কোথায়ই বা তিনি?

এই দ্বীপে আছে। আমি চিনতে পেরেছি আমার বাপুকে।

সত্যি বলছো জাভেদ?

ক্যাপ্টেন হুই বললেন-মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ঘরের। ওকে এই গুহার ভেতরে নিয়ে চলো। মা লুসি, তুমি ওর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করো, সব ওর মুখে জানা যাবে। তারপর আপন মনে বললেন ক্যাপ্টেন হুই-ভেবেছিলাম মাথুন দ্বীপে কোনো মানুষ কোনো সময় আসতে পারেনি, এখন দেখছি আমরাই শুধু নই আরও কেউ কেউ এই দ্বীপে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছে।

জাভেদকে লক্ষ্য করে বললো মিস লুসি-ওকে ছায়ায় নিয়ে চলো। ওর মুখখানা ফ্যাকাশে লাগছে। বড় মায়া হচ্ছে ওকে দেখে, আমার যদি মা বেঁচে থাকতেন।

মনিরার সংজ্ঞাহীন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে গুহার মধ্যে শুইয়ে দিলো জাভেদ। মিস লুসি তার বাবার ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এলো।

ফুল্লরা জাভেদের শরীরে কয়েক জায়গায় কাঁটার আঁচড়ের ক্ষত লক্ষ করে বললো—সব সময় তোমার অন্যমনস্ক ভাব। কেন তুমি গিয়েছিলে? আর ঐ মহিলাকেই বা পেলে কি করে?

জাভেদ অনেক দৌড়িয়েছে, সে বেশ ক্লান্ত, তাই কোনো জবাব না দিয়ে ওপাশে রক্ষিত পানির মশক থেকে পানি নিয়ে পান করলো।

ফুল্লরা নিজের আঁচল দিয়ে জাভেদের দেহের ক্ষতস্থানের গড়িয়ে পড়া রক্ত মুছে দিতে লাগলো। ওপাশে সংজ্ঞাহীন মহিলাটির দিকে তার তেমন খেয়াল নেই। জাভেদ ফিরে এসেছে, সেই আনন্দ তার মনকে উল্লসিত করে তুলেছে। ওকে হারিয়ে পাগলিনীপ্রায় হয়ে পড়েছিলো সে। এখন জাভেদকে পেয়ে তার মনপ্রাণ খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

মিস লুসি আর ক্যাপ্টেন আরফিন মনিরার সংজ্ঞা ফেরোনোর চেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে। সকলের মনেই একটা বিপুল আগ্রহ। কে এই মহিলাটি, যার বেশভুষা

এবং চেহারায় বাঙালীর ছাপ বিদ্যমান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলো মনিরার। চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হলো-কোথায় সে! শক্ত পাথরের শয্যায় শুয়ে আছে। পাশে একটি তরুণী, তার দেহে বিদেশী পরিচ্ছদ। অপর পাশে বলিষ্ঠ চেহারার এক বৃদ্ধ লোক। ওদের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার আভাস। ওরা তাকে চোখ মেলতে দেখে খুশি হলো।

তরুণী পিতাকে লক্ষ্য করে বললো–আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই বাবা, এর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

হাঁ মা, বিপদ কেটে গেছে। যাও মা লুসি, দুধ নিয়ে এসো। বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

মিস লুসি ব্যাগ খুলে শুকনো দুধ পানিতে মিশিয়ে তৈরি করে নিলো, তারপর বললো–বাবা, দুধ খাইয়ে দেবো?

বললেন ক্যাপ্টেন হুই-খাইয়ে দাও। এখন আমি বাইরে গেলাম। তোমরা ওর সঙ্গে বেশি কথা বলো না।

তোমার কথা স্মরণ থাকবে বাবা। তুমি নিশ্চিন্তে তোমার কাজে মনোযোগ দাওগে।

ক্যাপ্টেন হুই বেরিয়ে গেলেন।

এবার তারা জাহাজে ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

ক্যাপ্টেন হুই তাদের সংগৃহীত স্বর্ণ বস্তা বোঝাই করে মুখ বেঁধে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

মিস লুসি মনিরার সঙ্গে কথাবার্তা বলে বেশ ভাব জমিয়ে নিলো। মনিরার দু'চোখে পানি ঝরছিলো, বললো–আমাকে তোমরা কেন ধরে আনলে? জবাব দাও? কে তোমরা

মিস লুসি বললো–তুমি দুধটুকু খেয়ে নাও, তারপর আমি সব বলছি।

মনিরার সঙ্গে মিস লুসি ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছিলো।

মনিরা শিক্ষিতা, সেও মিস লুসির জবাব ইংরেজিতেই দিচ্ছিলো এবং প্রশ্ন করছিলো।

মনিরা অগত্যা দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে খেয়ে খালি পাত্রটি লুসির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, বললো–বলল আমাকে কেন তোমরা এখানে আনলে? তোমরা কে?

মনিরার সম্মুখের চুলগুলো আলগোছে সরিয়ে দিয়ে বললো লুসি-আমরা তোমাকে ধরে আনিনি, এনেছে আমাদের দলের একজন। যিনি এতক্ষণ তোমরা পাশে ছিলেন তিনি আমার বাবা-ক্যাপটেন হুই। আমরা অনেক বিপদ এড়িয়ে এই দ্বীপে এসেছি। আমার বাবার উদ্দেশ্য মাথুন দ্বীপ থেকে দেশবাসীদের জন্য কিছু স্বর্ণ সংগ্রহ করা।

মনিরা অবাক হয়ে শুনছিলো মিস লুসির কথাগুলো। বড় মিষ্টি করে কথা বলতে জানে মেয়েটা, ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে মায়াভরা চাহনি। কিছুক্ষণের মধ্যে হৃদয় জয় করে নিতে পারে। ওকে বড় ভাল লাগছে মনিরার। মনিরা যা প্রশ্ন করছে তার চেয়ে অনেক বেশি সে বলে যাচ্ছে।

মনিরা আর মিস লুসি কথা বলছিলো।

এমন সময় জাভেদ আর ফুল্লরা প্রবেশ করে সেখানে।

জাভেদকে দেখেই বিস্ময়ে চমকে ওঠে মনিরা, এ যে সেই তরুণ যাকে সে গভীর জঙ্গলে নিভু নিভু অগ্নিকুন্ডটার পাশে দেখেছিলো। যে ছোরা নিক্ষেপ করেছিলো বার বার তাদের দলবলের মধ্যে। সব চেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছে মনিরা তার স্বামীর চেহারার সঙ্গে বড় মিল আছে এই অদ্ভুত তরুণটির। ওর মুখের পাশেই আরও একটি মুখ ভেসে উঠছে মনিরার চোখের সামনে-তা নূরের মুখ। হুবহু মিল রয়েছে এদের চেহারায়।

ফুল্লরার পরনে ঘাগড়া, দুটো বিনুনি দুলছে দু'পাশে। জাভেদের পাশে দাঁড়িয়ে হতবাক দৃষ্টি ফেলছিলো সে মনিরার মুখের দিকে। তার মনোভাব জাভেদ এ মহিলাকে কোথা হতে এনেছে? সে অবাক হয়ে জাভেদের দিকে তাকিয়েই বা আছে কেন অমন করে? ফুল্লরা বললো–চলো জাভেদ।

না, আমি একটা কথা ওকে জিজ্ঞাসা করবো, আমার বাপুর সঙ্গে সে কেন মাথুন দ্বীপে এসেছে? বলো ফুল্লরা, ওকে জবাব দিতে বলো? কথাগুলো

স্পষ্টভাবে বললো জাভেদ।

মনিরার দু'চোখ তীব্র হয়ে উঠলো, বলে উঠলো সে-তোমার বাপু! তোমার বাপু দস্যু বনহুর?

ফুল্লরা জবাব দিলো-হাঁ, ওর বাপু দস্যু বনহুর, আমাদের সর্দার।

রাগান্বিত কণ্ঠে বললো মনিরা-না, আমি বিশ্বাস করি না। বনহুর মানে মনির চৌধুরী আমার স্বামী,..আমার স্বামী...কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে পড়লো অনেক দিন পূর্বের একটি ঘটনা...কান্দাইয়ে বনহুরের আস্তানায় যখন সে ছিলো সামান্য সময়ের জন্য তখন একটি মেয়েকে দেখেছিলো....একটা মুখ মনিরার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো, নাম তার নূরী। হাঁ, মনে পড়ছে নূরীর সন্তান ছিলো ঠিক তার নূরের মত চেহারা...খেয়াল হচ্ছে নূরী বনহুরকে ভালবাসতো যেমন মনিরা নিজে ভালবাসে স্বামীকে। নূরীর ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়েছিলো সেদিন মনিরা, সব ধীরে ধীরে মনে পড়ছে তার। ওর নাম ছিলো জাভেদ, মাত্র কয়েক বছরের ছেলে সে। সব ভুলে গিয়েছিলো মনিরা। আজ সব খেয়াল হলো। যদিও জাভেদ তাকে দেখেছিলো সেদিন, কোলেও এসেছিলো কিন্তু আজ আর ওর মনে নেই সেদিনের কথা। মনিরা বুঝতে পারলো ঐ নূরীও বনহুরের স্ত্রী এবং জাভেদও বনহুরেরই সন্তান। অবশ্য আগেও মনিরা নূরীর বিষয়ে আভাস পেয়েছিলো। প্রথম জাভেদের কথা শুনে মনিরার রাগ হয়েছিলো। এখন সে শান্ত হয়ে গেলো। সে ভাবলো নিয়তির উপর কারো হাত নেই। তাই সেও নিয়তিকে মেনে নিলো।

জাভেদ পূর্বের মত কণ্ঠেই বললো–দস্যু বনহুর আমার বাপু, আমাদের সর্দার....

ক্যাপ্টেন হুই গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো, আবার তিনি ফিরে এসে দাঁড়িয়েছেন, তার কাছে ঐ নামটা বিস্ময় সৃষ্টি করলো-দস্যু বনহুর! এ নামটা তার পরিচিত। বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর! তবে কি দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছে এই মাথুন দ্বীপে? একটা ভয়ার্তভাব জাগলো ক্যাপটেন হুই-এর মনে। আরও এলোমেলো ভাবনা এসে ভীড় জমালো ক্যাপটেন হুই-এর মনের আকাশে। তাহলে কি দস্যু বনহুরের দৃষ্টি পড়লো তাদের ওপর?...ক্যাপটেন হুই আলগোছে বেরিয়ে গেলেন, গুহার বাইরে পায়চারী করতে লাগলেন তিনি।

যতই ভাবছেন ততই বিস্ময় জাগছে তার মনে। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে অনেক কথাই তার কানে এসেছে। কান্দাই শহরে দস্যু বনহুর বাস করলেও তার বিচরণ সারা পৃথিবী জুড়ে। কখন কোন রাজ্যে তার আবির্ভাব ঘটবে কেউ বলতে পারে না। অনেক অবিশ্বাস্য কাহিনী ক্যাপটেন হুইয়ের কানে এসেছে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে কিন্তু তিনি ভাবতেও পারেননি মাথুন দ্বীপে দস্যু বনহুরের মুখোমুখি হবেন।

লুসিও কম অবাক হয়নি, সে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো তাদের কথাবার্তা আর মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না। দস্যু বনহুর নামটা সে শুনেছিলো কিন্তু তার সম্পর্কে কিছু জানে না। অবাক হয়ে শুনে যাচ্ছে।

জাভেদ বললো–তোমাকে আমি চিনি না। আমার বাপুর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক তাও জানি না।

মনিরা উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এলো জাভেদের পাশে। এবার কোমল কণ্ঠে বললো সে–জাভেদ, তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে চিনতে পারছি, যদিও একটু পূর্বেও তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। তোমাকে ছোটবেলায় আমি দেখেছি। তোমার আম্মির সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ ঘটেছিলো তোমার বাপুর আস্তানায়। তুমিও আমাকে দেখেছিলে কিন্তু তোমার স্মরণ নেই। তুমি খুব ছোট ছিলে তখন।

জাভেদ পূর্বের মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো–ইচ্ছা করলে আমি তোমাকে হত্যা করতে পারতাম। আমার বাপুর সঙ্গে তোমাকে আমি দেখতে চাই না।

ফুল্লরা কিছু বলতে যাচ্ছিলো এমন সময় ক্যাপটেন হুইয়ের গলা শোনা গেলো- মা লুসি, দেখবে এসো, কারা যেন এদিকে আসছে।

জাভেদ, ফুল্লরা এবং লুসি বেরিয়ে এলো।

তারা ক্যাপটেন হুই-এর পাশে এসে দাঁড়াতেই ক্যাপটেন হুই আংগুল দিয়ে পর্বতমালার পাদদেশে দেখিয়ে দিলেন-ঐ দেখো….

সবাই দেখলো কয়েকজন লোক আসছে, সবার হাতেই আগ্নেয় অস্ত্র রয়েছে। তারা পর্বতমালার উপরে উঠে আসছে। তারাও তাদেরকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা ক্যাপটেন হুই-এর দলকে শত্রু মনে করে আগ্নেয়অস্ত্রখানি উদ্যত করে এগিয়ে আসছে।

কখন যে মনিরও ওদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ তা লক্ষ করেনি। সামনে তাকিয়েই মনিরার চোখে দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। যদিও আগন্তুক বেশ দূরে ছিলো তবুও চিনতে ভুল হলো না তার। বনহুর আসছে। তার সঙ্গে কয়েকজন রয়েছে-তারা সবাই মনিরার পরিচিত।

ক্যাপটেন হুই বললেন-ডিরোমা, তোমরা সাবধান হয়ে যাও। যারা আসছে তারা কেমন লোক জানি না, আর কি উদ্দেশ্য নিয়েই বা তারা আসছে বলা যায় না।

জাভেদ বললো–বাপু, ঐ তো আমার বাপু....

ফুল্লরা আনন্দধ্বনি করে উঠলো-সর্দার, সর্দার আসছেন জাভেদ। আমার বাপুও আছে তার সঙ্গে...মিস লুসি, আমার খুব আনন্দ লাগছে....আমাদের সর্দার আর আমার বাপু আসছে....

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা আরও নিকটবর্তী হলো।

ক্যাপটেন হুই-এর মনে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো, দস্যু বনহুরকে তিনি স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

ততক্ষণে বনহুর রহমান ও অন্যান্য সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

অপরিচিত দল।

ক্যাপটেন হুই-এর নির্দেশে তার দল অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ যদি ওরা আক্রমণ করে বসে তাহলে যেন এরা পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে।

কিন্তু দূর থেকেই বনহুর জাভেদ আর ফুরাকে চিনতে পেরে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলো। ফুল্লরাও তাদের সর্দারকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বনহুর ও তার দলবল মনিরাকে লক্ষ্য করছে।

ফুল্লরা ছুটে ওর পিতা রহমানের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকলো-বাপুজী...তারপর বনহুরের কাছে এগিয়ে গেলো সর্দার.....

বনহুর ফুল্লরার মাথায় হাত রেখে সস্নেহে বললো–তোমাদের মাথুন দ্বীপে দেখতে পাবো ভাবতে পারিনি ফুল্লরা। এগিয়ে গেলো বনহুর মনিরার দিকে...তুমি এখানে আর আমরা তোমাকে সমস্ত জঙ্গল খুঁজে ফিরছি...কে তোমাকে এখানে এনেছে?

বললো ফুল্লরা-জাভেদ ওকে এনেছে....

তাহলে কি জাভেদ তুমি আমাদের লক্ষ করে ছোরা নিক্ষেপ করতে?

হাঁ বাপু, আমিই...আমিই ছোরা নিক্ষেপ করেছি তোমাদের পথ চিনিয়ে নিয়ে আসার জন্য। কথাগুলো স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো জাভেদ।

ক্যাপ্টেন হুই এবং মিস লুসি অবাক হয়ে দেখছিলো।

তারা ভাবতেও পারেনি জাভেদ আর ফুল্লরার সঙ্গে দস্যু বনহুরের সম্বন্ধ আছে। সব যেন বিস্ময়কর লাগছে তাদের কাছে।

বনহুর বললো–তোমরা কান্দাই জঙ্গল থেকে হারিয়ে গিয়েছিলে। তারপর এই মাথুন দ্বীপে এলে কি করে?

ফুল্লরা বললো সে অনেক কথা সর্দার, সব পরে জানতে পারবেন। আমাদের উদ্ধার করেছেন ঐ উনি। ক্যাপ্টেন হুইকে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো ফুল্লরা।

বনহুর হাত বাড়িয়ে দিলো ক্যাপ্টেন হুই-এর দিকে আমার নাম মনির চৌধুরী। আপনি জাভেদ ও তার সঙ্গী ফুল্লরার জীবন রক্ষা করেছেন, তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

ক্যাপ্টেন হুই বনহুরের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন-আমার নাম ক্যাপ্টেন হুই। আমরা ওদের উদ্ধার করেছি বটে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উপকৃত হয়েছি ওদের সহায়তা পেয়ে। ফুল্লরা আর জাভেদ আমাদের সঙ্গীই শুধু নয়, তারা আমার সন্তানের মত।

বনহুর মনিরার সান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো, মনিরাকে এখানে দেখবে ভাবতে পারেনি সে।

ঠিক রহমানও তেমনি খুশি হয়েছে এখানে বৌরাণীকে দেখে, তারও মনও আনন্দে আপুত হয়ে উঠলো। এগিয়ে গেলো সে মনিরার কাছে, শান্ত গলায় বললো, বৌরাণী, আপনি ভাল আছেন তো?

মনিরার চোখেমুখেও আনন্দদ্যুতি ঝরে পড়ছে সে আনন্দভরা কণ্ঠে বললো– জাভেদ রাতের অন্ধকারে আমাকে জোর করে তুলে এনেছিলো। তখন আমি ওকে চিনতে পারিনি রহমান।

লুসি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন-মা লুসি, ঐ ব্যক্তি সাধারণ মানুষ নন। তুমি হয়তো দস্যু বনহুরের নাম শুনেছো?

হাঁ বাবা, আমি কিছু কিছু শুনেছিলাম তারপর শুনলাম জাভেদ যখন ঐ ভদ্র মহিলার সঙ্গে আলাপ করছিলো তখন। সত্যি বাবা দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমার যেমন ধারণা ছিলো ওকে দেখে আমার সে ধারণা পাল্টে গেছে, আমি অবাক না হয়ে পারছি না।

পিতা এবং কন্যা অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথাবার্তা হচ্ছিলো।

বনহুরের দল এবং ক্যাপ্টেন হুই-এর সঙ্গীসাথী মিলে একত্র হয়ে মাথুন দ্বীপ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলো। কিছু পূর্বেও ক্যাপ্টেন হুই-এর মনে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিলো তা সম্পূর্ণ মুছে ফেললো। দস্যু হলেও সে একজন মহৎ চরিত্রের মানুষ এ প্রমাণ তারা পেলো।

ক্যাপ্টেন হুই বনহুরের নিকটে নরখাদক এবং সমুদ্রগর্ভের সেই ভয়ংকর জলজীব সম্বন্ধে সব খুলে বললেন। শুধু নরখাদক আর সেই ভয়ংকর জলজীবই নয়, জাভেদ আর ফুরাকে কিভাবে তারা উদ্ধার করেছিলেন সব বললেন ক্যাপ্টেন হুই।

বনহুরের মন ক্যাপ্টেন হুই-এর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো।

মনিরা আর ফুল্লরার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিলো রহমান। যখন মনিরা কান্দাই আস্তানায় গিয়েছিলো তখন জাভেদ আর ফুল্লরার বয়স অত্যন্ত কম ছিলো। এ কারণে তারা মনিরাকে চিনতে পারেনি, জাভেদ জানতে তার বাপু

শুধু তাদেরই। তার বাপুর দ্বিতীয় স্ত্রী থাকতে পারে এ কথা সে কল্পনাও করেনি কোনোদিন।

রহমান জাভেদ আর ফুল্লরাকে বুঝিয়ে বললো সব কথা।

জাভেদ যাকে ধরে এনেছে সে বৌরাণী এ কথা এবার জাভেদ ভালভাবে অনুধাবন করলো। তার বাপুর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তাও জানলো সে।

মনিরার সঙ্গে কিছু অসৎ আচরণ করেছে বলে লজ্জিত হচ্ছিলো জাভেদ। মনিরা তা বুঝতে পারলো এবং তাকে কাছে ডেকে নিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে বললো– তুমি আমাকে চিনতে না তাই ভুল বুঝেছিলে। জাভেদ, তুমিও আমার ছেলে।

জাভেদ গভীর আবেগভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো মনিরার মুখের দিকে।

ফুল্লরাও মনিরাকে মেনে নিলো আপনজনের মত।

সেদিনটা বেশ আনন্দে কাটলো সবার।

বনহুর আর মনিরা ক্যাপ্টেন হুই-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মেতে উঠলো। লুসিও যোগ দিলো তাদের আলোচনায়।

মাথুন দ্বীপের সৌন্দর্য সবাইকে মুগ্ধ করেছে। এত সোনা মাটির সঙ্গে মিশে থাকতে পারে তারা আর কোনোদিন কোথাও দেখেনি। মনিরার দু'চোখে খুশির উচ্ছ্বাস। স্বামী এবং পুত্র সমতুল্য জাভেদ আর ফুরাকে পেয়ে সে আনন্দে আত্মহারা।

দুদিন কেটে গেলো।

উভয় দলের সঙ্গে ছিলো কিছু খাবার এবং পানীয়। ক্রমে সে সব শেষ হয়ে আসছে। চিন্তা হলো ক্যাপ্টেন হুই-এর। সঙ্গের খাবার এবং পানি শেষ হলে হয়তো ফিরে যাওয়াই সম্ভব হবে না। প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ হয়েছে, আর স্বর্ণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক্যাপ্টেন হুই তার দলবল নিয়ে জাহাজে ফিরে যাবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। কথাটা বনহুরের কাছে বললেন ক্যাপ্টেন হুই!

বনহুর সম্মতি জানালো এবং তারাও তাদের ডুবুজাহাজে ফিরে যাবে, এই কথাও বললো।

উভয় দলই নিজ নিজ জাহাজে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

এমন সময় এক দিন বনহুর ডঃ ডাওনা লর্ডের ডায়রীর শেষ অংশ মেলে দেখতে লাগলো। হঠাৎ কিছু মচমচে পাতা খুলে এলো তার হাতের মুঠায়। কিছু স্পষ্ট কিছু অস্পষ্ট ইংরেজী লেখা আঁকাবাকা হরফে। অতিকষ্টে পড়লো বনহুর?

পর্বতমালার দক্ষিণদিকে একটা গুহামুখ আছে। গুহামুখে পাথরচাপা দিয়ে আমি বন্ধ করে দিলাম। যদি কোনো দিন আমার সুদিন আসে তাহলে ঐ পাথর সরিয়ে আমি গুহায় প্রবেশ করবো। এই গুহায় একটি সুড়ঙ্গপথ আছে। সুড়ঙ্গ ধরে এগুলে পর্বতমালার তলদেশে এসে পৌঁছবো। এটা একটি স্বর্ণগুহা। এককালে, প্রায় কয়েক হাজার বছর পূর্বে এই গুহাই ছিলো আগ্নেয়গিরি মুখগহ্বর। এই মুখগহ্বর দিয়ে লেলিহান অগ্নিশিখার সঙ্গে গলিত লাভার সঙ্গে বেরিয়ে আসতে গলিত স্বর্ণ...যা এখন মাথুন দ্বীপের মাটিতে মিশে আছে...আমি যেমন করে থোক এই গুহায় প্রবেশ করবো এবং পাতালপুরীতে সেই স্বর্ণগুহায় যাবো...অবশ্যই আমি যাবো...তবে এখন ক্ষুধা-পিপাসা আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে...আমি আমার সঙ্গীদের মাংস খেয়ে বেঁচে আছি...জানি না আমার ভাগ্য হবে কিনা...তবে আমি যাবোই...জাহাজ ভর্তি করে সোনা নিয়ে দেশে ফিরবো। ঈশ্বর আমাকে জীবিত রেখো...আমি যেন মাথুন দ্বীপ জয় করতে পারি...উঃ! কি ক্ষুধার জ্বালা...পিপাসা...ভাগ্যিস আমার শরীরে রক্ত ছিলো তাই...আমি আমার কলম চালাতে সক্ষম হচ্ছি। রক্তগুলো বড় আঠালো সেই কারণে কাগজগুলো চটচটে হয়ে যাচ্ছে...মুখের থু থু আর রক্ত মিশিয়ে লিখছি...কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে লিখতে পারবো...তবুও লেখবো যতক্ষণ আমার শরীরের রক্ত আছে...মাথুন দ্বীপে শুধু আমি একা...একটি প্রাণীও নেই যে আমার কষ্ট বুঝবে বা দেখবে...ঈশ্বর, তুমি আমাকে দেখছো...রাতে আমার পাশে তুমি আছো...কিন্তু আমি বড় অসহায় মনে করছি নিজকে...হয়তো আর দেশে ফিরে যেতে নাও পারি...আমার জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসছে...তবে দেহের শক্তি কমেনি...অনেকগুলো মানুষ আমি খেয়েছি...তাজা মানুষের মাংস আর তাজা রক্ত আমার দেহটাকে পুষ্ট আর সতেজ করেছে... আমাকে বাঁচাতে হবে...আমি বাঁচতে চাই...আমি মরতে চাই না,..মাথুন দ্বীপ আমি... চষে... বে... নতুন,.. সা... ভরা...

বনহুর আর ক্যাপ্টেন হুই মিলে অনেক চেষ্টা করেও অন্যান্য অংশ পড়তে পারলো না। বহুক্ষণ চেষ্টার পর কয়েক লাইন বনহুর পড়তে সক্ষম হলো। ক্যাপ্টেন হুই-এর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো বনহুর—বন্ধু, আর দুটো দিন আপনারা অপেক্ষা করুন। ডঃ ডাওনা লর্ড যা উদ্ধার করতে পারেনি, আমরা তা উদ্ধার করতে পারি কিনা দেখি। জানি না সেই গুহামুখ আমরা খুঁজে পাবো কিনা।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন-এতবড় পর্বতমালার কোথায় কোন স্থানে সেই পাথর চাপা দেওয়া আছে কে জানে। মা লুসি, তুমি কি আর দুটো দিন মাথুন দ্বীপে কাটিয়ে যেতে চাও?

লুসি তাকালো বনহুরের দিকে, তারপর বললো—উনি যখন বলছেন, থেকেই যাও দুটো দিন।

মনিরা অদূরে একটা পাথরখন্ডে বসে ক্যাপ্টেন হুই আর বনহুরের কথাবার্তা শুনছিলো। তার মোটেই ইচ্ছা নয় এ দ্বীপে আর অপেক্ষা করে। কখন কোন বিপদ আবার ওৎ পেতে আছে কে জানে। এতক্ষণ ডায়না লর্ডের ডায়রী মাঠ মনোযোগ সহকারেই শুনছিলো মনিরা, একটা চিন্তা উঁকি দিচ্ছিলো তার মনে-হঠাৎ কোনো একটা নতুন কিছু তার স্বামীর মাথায় না প্রবেশ করে। মনিরা জানে তার স্বামী কেমন মানুষ, রহস্যজনক কিছু একটার সংবাদ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে আর রক্ষা নেই। সে কাজ তার সমাধা করা চাই।

মনিরা বললো—আমার কিন্তু আর একটি মুহূর্ত এ দ্বীপে থাকতে মন চাইছে না। লুসি তুমিও মত দিও না।

লুসি হেসে বললো—দেখা যাকনা নতুন গুহায় কি পাওয়া যায়? হয়তো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন মিঃ মনির চৌধুরী...

সবাই মিলে পাহাড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো সেই পাথর খন্ডটা যা গুহামুখে বসানো রয়েছে। কোথায় সেই পাথরখন্ড। বনহুরের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি পাহাড়ের কোথাও এমন পাথর থাকে তাহলে তার দৃষ্টি এড়াতে পারবে না কিছুতেই।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর পর্বতমালার দক্ষিণ অংশে একটি পাথর খন্ড সত্যিই বনহুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। হঠাৎ করে কেউ সেই পাথরটাকে দেখলে বুঝতেই পারবে না যে, ঐ পাথরটি পবর্তের একটি স্তর নয়। পাথরটি এমনভাবে গুহামুখে স্থাপন করা হয়েছে যে দেখে মনে হবে ওটা পৃথক কোন পাথরখন্ড নয়। কিন্তু বনহুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা এড়ায়না। পাথর খন্ডের গায়ে তিনটি অক্ষর পাথর কেটে লেখা হয়েছে, ডি, ও, এন্। লেখাগুলো স্পষ্ট নয়, তবুও অনেক কষ্টে বনহুর লেখাগুলো উদ্ধার করতে পেরেছে।

এই পাথরখন্ডটিকে খুঁজে বের করতে গিয়ে গোটা একটি দিন কেটে গেলো।

পরদিন অনেক চেষ্টার পর গুহামুখ থেকে সরিয়ে ফেলা হলো সেই ডি, ও, এন খোদাই করা পাথরখানা। ভেতরে একটা গভীর গর্ত-কোনো সিঁড়ি বা সুড়ঙ্গমুখ দেখা গেলো না। ক্যাপ্টেন হুই ও তার দলবল ভয় পেয়ে গেলো। এ গর্তটি অদ্ভুত ধরনের। গর্তের ভেতরে এতটুকু আলো প্রবেশ করে না। জমাট অন্ধকার, ভয়ংকর একটা থমথমে ভাব গর্তে বিরাজ করছে।

ক্যাপ্টেন হুই বললেন-কোনো কালে এই মুখগহ্বর থেকে স্বর্ণযুক্ত লাভা উদগীরণ হতে আজ হিমশীতল আর মৃতবৎ গুহায় পরিণত হয়েছে। জানিনা ভাওনা লর্ড এই আগ্নেয়গিরির গহ্বরে কিসের সন্ধান পেয়েছিলো। যার জন্য সে তার ডায়রীতে এই দুর্গম মুখ গহ্বর সম্বন্ধে লিখে রেখেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলো।

রহমান ও তার অন্যান্য অনুচর মনোযাগ সহকারে বনহুরকে সহযোগিতা করছিলো।

ক্যাপ্টেন হুই-এর কথায় বললো বনহুর–ডায়রীতে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে ঠিক তেমনি দেখতে পাচ্ছি না ক্যাপ্টেন। কোথায় সুড়ঙ্গপথ?

হাঁ ঠিক বলেছেন মিঃ চৌধুরী, ডাওনা লর্ডের বর্ণনার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এই গুহায় গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জাভেদ এতক্ষণ নিশ্চুপ ছিলো, সে বললো–আমি নামবো এই গুহায়, দেখবো এর ভেতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে।

ফুল্লরা বলে উঠলো–না, তোমাকে গুহায় নামতে দেবো না জাভেদ। তুমি নামলে আর ফিরে আসবে না।

জাভেদ পুনরায় বলে উঠলো–আমি তোমার কথা শুনবো না ফুল্লরা। তুমি আমাকে বারণ করো না।

বনহুর বললো–জাভেদ, তা হতে পারে না। তুমি ছেলেমানুষ, ঐ গহ্বরে প্রবেশ করলে কোনো বিপদ আসতে পারে। আমি ভেতরে প্রবেশ করবো....

বনহুরের কথায় মনিরা শিউরে উঠলো, সে জানে বনহুর কারও বারণ মানবে না, সে যা মনে করবে তা সমাধা করা চাই। আতঙ্কিতভাবে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়ালো মনিরা, বললো–ওগো আর তুমি এই নতুন বিপদের ঝুঁকি নিও না। আমি অনেক সহ্য করেছি আর পারবো না, চলো ফিরে যাই।

চিন্তা করো না মনিরা। আমি এই গুহায় প্রবেশ করবো এবং ফিরে আসবো রহস্য উদঘাটন করে।

না না তা হয় না। যদি আর ফিরে না আসো।

জাভেদ বললো–আমিই যাবো বাপু, তুমি আমাকে যাওয়ার অনুমতি দাও?

তা হয় না জাভেদ, আমি যাচ্ছি। যদি ভেতরে কোনো অসুবিধা মনে করি তাহলে গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবো না। ফিরে আসবো তাড়াতাড়ি, তোমরা আমার জন্য মোটেই ভেবো না। ক্যাপ্টেন হুই-এর করমর্দন করে হাত বাড়ালো রহমানের দিকে-রহমান, ঘাবড়িও না।

সর্দার।

রহমান, মনিরার দিকে লক্ষ রেখো।

মনিরা বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরলো-তুমি আবার বিপদে পা বাড়ালে? আবার আমাকে কাঁদাবে তুমি?

মনিরা, তুমি মিছামিছি ভাবছো, আমি জানি এর মধ্যে...কথা শেষ করতে দেয় না মনিরা, বলে উঠলো–তুমি যাবে, তবে আমাকেও নিয়ে চলো। ঐ দুর্গম গহ্বরে

তোমার সঙ্গে আমিও মরবো।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো বনহুর–তোমাদের মন এত দুর্বল। সব কিছুতেই ভয় আর ভীতি। ছাড়ো মনিরা, যেতে দাও।

লুসি মনিরার মতই ভীত হচ্ছিলো, সে বললো–আমিও কিন্তু মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে একমত। অজানা-অচেনা এক গুহায় প্রবেশ করা সমীচীন নয় মিঃ চৌধুরী।

মিস লুসি, আপনিও একথা বলছেন। মনিরা আপনাদের সঙ্গে থাকবে, আপনারা ওকে দেখবেন...ছেড়ে দাও মনিরা।

বনহুর আর বিলম্ব না করে নেমে পড়লো সেই ভয়ংকর অদ্ভুত গুহায়।

জাভেদ কোনোদিন এমন করে তার বাপুর জন্য ভাবেনি। আজ তাকে বেশ চিন্তিত লাগছে।

ফুল্লরা নির্বাক হয়ে পড়েছে। সে তাকাচ্ছে জাভেদ আর ক্যাপ্টেন হুই-এর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পূর্বেও তাদের মনে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস ছিলো এক্ষণে তা মুছে গেলো। সবার মুখেই একটা গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

বনহুর আগ্নেয়গিরির গহ্বরে প্রবেশ করার সময় অক্সিজেন বক্স এবং নিজের রিভলভারখানা ও ক্ষুদে টর্চটি কোমরের বেল্টে ভালভাবে আটকে নিলো। তারপর এগিয়ে চললল, পাথরখন্ড ধরে কৌশলে নামতে লাগলো সে। কিছুটা নামতেই পায়ে কিছু স্পর্শ করলো। বনহুর কোমরের বেল্ট থেকে টর্চটা খুলে নিয়ে আলো ফেললো। আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো বনহুরের চোখ দুটো, দেখলো পায়ের নিচে সিঁড়ির মত স্তরে স্তরে পাথরখন্ড সাজানো। ঠিক সিঁড়ির মত করে রাখা হয়েছে। বনহুর আরও লক্ষ্য করলো পাথরখন্ডের চারপাশে চাপ চাপ সোনা। টর্চের আলোতে ঝকমক করছে সোনার স্তরগুলো।

বনহুর আরও নিচে নামতে লাগলো।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সূর্যের রশ্মিও নজরে পড়ছে না। কোনোরূপ সাড়াশব্দও নেই গুহার ভেতরে, সব যেন নিস্তব্ধ। বনহুরের নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবার। যখনই নিচে নামছে ততই জমাট অন্ধকার আর বায়ুহীন গুমোট একটা রুদ্ধভাব। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি বনহুর অক্সিজেনপূর্ণ মুখোশ

পরে নিলো। টর্চের আলো ফেলে নামতে লাগালো সে। কিন্তু বনহুর বুঝে উঠতে পারছে না, ক্রমেই তার দেহটা কেমন যেন অবসন্ন মনে হচ্ছে। বনহুরের কানের কাছে মনিরার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি...না না, আমি তোমাকে ঐ দুর্গম গুহায় প্রবেশ করতে দেবো না। তুমি যেতে পারবে না...তুমি যেতে পারবে না...একি! বনহুরের হাত দু'খানা ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে এলো। তারপর তার সংজ্ঞাহীন দেহটা গড়িয়ে পড়লো।

*

এক ঘন্টা দুঘন্টা করে কেটে গেলো কয়েক ঘন্টা।

গুহামুখের চারপাশ ঘিরে বসে আছে ক্যাপ্টেন-হুঁই-এর দল এবং বনহুরের অনুচরগণ। সবাই ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে বনহুরের। মনিরার বুকখানা টিপ টিপ করছে না জানি ঐ গুহায় কি ভাবে আছে সে। কোনো বিপদ ঘটেনি তো? বার বার চোখে পানি এসে যাচ্ছিলো, কিন্তু নিজকে কঠিনভাবে সংযত রাখছিলো মনিরা।

জাভেদ গুহায় প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলো, কিন্তু সবাই তাকে বাধা দিলো। বনহুর ফিরে না আসা পর্যন্ত ঐ দুর্গম গুহায় কাউকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

রহমান, মাহবুব এবং ডুবুজাহাজের চালক সবাই উদ্বিগ্ন, চিন্তিত, তারা নানাভাবে ভেতরে সন্ধান চালাচ্ছে। পাওয়ারফুল টর্চ ফেলে ভেতরে লক্ষ্য করছে কিন্তু নজরে পড়ে না।

ক্যাপ্টেন হুই, মিস্ লুসি সবাই চিন্তিত।

কারণ অল্প সময়ে বনহুরের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ক্যাপ্টেন হুই। সামান্য দুটো দিনের পরিচয় মাত্র, তবু যেন অনেক দিনের চেনা মনে হচ্ছিলো তাদের কাছে। বনহুর যখন ঐ অদ্ভুত গুহায় প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তখন তাকে সবাই বারণ করছিলো কারণ ঐ গুহার মধ্যে কি আছে কেউ জানে না। রহমান, মাহবুব এরা জানে সর্দার তাদের কোনো কথা কানে। নেবে না তাই তারা ঘোর আপত্তি না করে নিশ্চুপ ছিলো।

সর্দার এখনও ফিরে এলো না।

সবার মুখে বিষণ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে।

মনিরা আর ফুল্লরা সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

কত সাধনার পর মনিরা স্বামীকে ফিরে পেয়েছিলো। কত বাসনা কামনা ছিলো তার মনে...স্বামী সহ ফিরে যাবে কান্দাই শহরে। নূর এবং মামীমা প্রতীক্ষা করছেন। না জানি নূর। কত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সন্ধান চালিয়ে চলেছে মায়ের। কিন্তু কেন এমন হলো, সে তো ধনরত্ন, স্বর্ণ কিছু চায় না। কেন তার স্বামী তাকে একা রেখে এমনভাবে দুর্গম গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। মনিরার ইচ্ছা করছে চিৎকার করে কাঁদে কিন্তু এত লোকের সামনে লজ্জায় তা পারে না। তাই, মনিরা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে চলে। রহমান কিন্তু বুঝতে পারে, বৌরাণীর মনে যে দারুণ একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে সে। কিন্তু কি সান্ত্বনা দেবে। ভেবে পায় না রহমান ও তার সঙ্গীসাথীরা।

সমস্ত দিন কেটে গেলো তবুও বনহুর ফিরে এলো না।

ক্যাপ্টেন হুই-এর দলবল জাহাজে ফিরে যাওয়ার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়।

ক্যাপ্টেন হুই এবং লুসিরও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ফিরে যাবার জন্য কিন্তু মানবতার খাতিরে তারা মনিরা ও তার সঙ্গীদের ফেলে যেতে পারছে না। ক্যাপ্টেন হুই তার দলের কয়েকজনকে হারিয়ে ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন মনে, মাথুন দ্বীপে তিনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে তবে যথেষ্ট ত্যাগও তাকে দিতে হয়েছে।

লুসি জানে, জাভেদ যদি সেই ভয়ংকর জলজীবটাকে হত্যা করতে সক্ষম না হতো তাহলে আজ ক্যাপ্টেন হুই-এর মনোবাসনা পূর্ণ হতো না। ক্যাপ্টেন হুইও এ কথা স্বীকার করেন মনেপ্রাণে। আর সেইজন্যই জাভেদ আর ফুল্লরাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।

লুসিও ভালবাসে ফুল্লরা আর জাভেদকে। ওরা এই ক'দিনের মধ্যে পরম আপনজনের মত হয়ে গেছে। সব সময় ওদের কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছা করে লুসির। জাভেদের সরল সহজ-ভাবধারা তার ভাল লাগে।

ফুল্লরা কিন্তু লুসিকে সহজ দৃষ্টি নিয়ে দেখে না। জাভেদের সঙ্গে লুসির মেলামেশা সে মোটেই পছন্দ করে না। ফুল্লরার মন সর্বক্ষণ জাভেদকে ঘিরে রয়েছে। একটু সময় যদি চোখের আড়ালে যায় সে তখন চঞ্চল হরিণীর মত ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বনহুর যখন ফিরে আসছে না তখন জাভেদ ভূগর্ভে নামার জন্য ভীষণ আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলো কিন্তু তাকে ঐ ভয়ংকর গুহার মধ্যে কেউ নামতে দেয়নি।

জাভেদ ছটফট করছিলো। সর্দার বিপদে পড়েছে তাই রহমান ও তার দলবল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু কেউ কোনো উপায় স্থির করতে পারছে না।

দুটো দিন কেটে গেলো।

ক্যাপ্টেন হুই-এর সঙ্গে যে শুকনো খাবার এবং পানি ছিলো তা শেষ হয়ে গেছে।

এমন কি বনহুরের দলবলের সঙ্গের খাবার ও পানিও নিঃশেষ।

ক্যাপ্টেন হুই তার দলবলসহ বিদায় গ্রহণ করলেন।

বিদায় মুহূর্তে রহমান ও মনিরার হাত ধরে ক্যাপ্টেন হুই অশ্রু বিসর্জন করলেন কারণ তাদের সঙ্গে খাবার এবং পানীয় কিছু পরিমাণ থাকলেও তারা আরও কিছুদিন মাথুন দ্বীপে কাটিয়ে যেতেন।

রহমান, মাহবুব, জন, মনিরা, ফুল্লরা আর জাভেদ এবং দু'জন অনুচরসহ এই পর্বতমালায় প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

ক্যাপ্টেন হুই-এর দল বিদায় গ্রহণ করার পর বড় নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিলো রহমান ও তার দলবলের। সর্দারের এভাবে অন্তর্ধান তাদের সমস্ত আশা-ভরসা মুছে দিয়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন হুই জাভেদকে একটি হীরার আংটি উপহার দিলো। অতি-মূল্যবান সে আংটি, জাভেদ ঐ আংটিটা ফুল্লরার আংগুলে পরিয়ে দিলো। কারণ জাভেদের কাছে ঐ আংটির কোনোই মূল্য নেই। শিশুকাল থেকেই জাভেদের ধনসম্পদ মণি-মাণিক্যের প্রতি লোভ নেই। তার কাছে এসব বস্তু তুচ্ছ।

ফুল্লরা অবশ্য খুশি হলো হীরার আংটিটা পেয়ে, কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশের মত মনের অবস্থা নেই এ মুহূর্তে। সবাই সর্দারের জন্য মুষড়ে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন হুই-এর দল ইচ্ছামত স্বর্ণ সংগ্রহ করে ফিরে চললো। তাদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। বিদায়কালে ক্যাপ্টেন হুই জাভেদের আংগুলে নিজ হাতে হীরার আংটিটা পরিয়ে দিয়ে অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে বলেছিলেন, আশীর্বাদ করি তুমি জয়যুক্ত হও।

যখন ক্যাপ্টেন হুই বিদায় নিয়ে দলবলসহ চলে গেলেন তখন জাভেদের চোখ দুটোও অশ্রুছলছল হয়ে এসেছিলো। ওর মনেও মায়ার সঞ্চার হয়েছিলো ক্যাপ্টেন হুই এবং লুসির প্রতি।

হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলো জাভেদ।

শুধু জাভেদ নয়, ফুল্লরা এবং রহমানও হাত নেড়ে বিদায় জানালো।

ওরা চলে যাচ্ছিলো পর্বতমালার গা বেয়ে।

তাকিয়ে ছিলো রহমান দলবল নিয়ে, যতক্ষণ দেখা গেলো ততক্ষণ কেউ দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না।

এদিকে যখন রহমান তার দলবল নিয়ে ক্যাপ্টেন হুইকে বিদায় জানাচ্ছিলো তখন সেই সুপ্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসে বনহুরের। চোখ মেলে তাকাতেই তার নজরে পড়ে জমাট অন্ধকার। মুখে অক্সিজেনভরা মুখোশ আটকানোই আছে। হাতের টর্চখানা খুঁজে পাওয়া গেলো না।

উঠে বসলো বনহুর।

সব কথা স্মরণ হলো তার। সে তার সঙ্গী-সাথীদের মাথুন দ্বীপের এক পর্বতমালার উপরে রেখে এসেছে। মনিরা, রহমান, জাভেদ ফুল্লরা এবং ক্যাপ্টেন হুই এর দলবল...সব মনে পড়ছে তার। অদ্ভুত গুহার মধ্যে প্রবেশ করার সময় মনিরা, রহমান এবং ক্যাপ্টেন হুই সবাই তাকে বারণ করেছিলো এই দুর্গম গহ্বরে প্রবেশ করতে।

কিন্তু কারও বাধা সে শোনেননি।

আজ এটা নতুন নয় তার জীবনে। অজানাকে জানা এবং বিপদকে জয় করাই হলো তার জীবনের ব্রত। বনহুর নিজকে শক্ত করে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিছুই নজরে পড়ছে না। আবার সে বসে হামাগুড়ি দিয়ে হাতের ছিটকে পড়া টর্চলাটই খুঁজতে লাগলো।

অনেক হাতড়েও পেলোনা টর্চলাইটটা।

উঠে দাঁড়ালো সে, এগুতে লাগলো পা পা করে। কিছুটা এগুতেই সে কি যেন একটা জিনিসে হোঁচট খেলো। বনহুর হাতে তুলে নিলো বস্তুটা। বস্তুটা হাতে তুলতেই অন্ধকারেও তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। মহা বিপদ মুহূর্তে একটা ক্ষীণ আশা জাগলো তার মনে। হাতে স্পর্শ করলো তার হারিয়ে যাওয়া ক্ষুদে টর্চখানা।

বনহুর আলো জ্বাললো। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সে। চারদিকে শুধু সোনা আর সোনা। এতো সোনা সে কোনোদিন দেখেনি। স্বর্ণখনি পৃথিবীতে আছে সে জানে কিন্তু ভূগর্ভে এত স্বর্ণ থাকতে পারে তা কখনও কল্পনাও করতে পারেনি সে।

টর্চের তীব্র আলোতে বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

আঁকাবাকা পথ।

দু’পাশে দেয়াল, সাধারণ দেয়াল নয়-স্বর্ণের দেয়াল।

বনহুর এগিয়ে চললো। উঁচুনীচু জায়গাটা। বনহুর বেশ বুঝতে পারছে সে একটা মৃত অগ্নেয়গিরির গহবরের তলদেশে পৌঁছে গেছে। উপরের দিকে কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না, শুধু জমাট অন্ধকার। এক দিন এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে গলিত লাভা আর স্বর্ণের স্রোতধারা বয়ে যেতো। সেই গলিত স্বর্ণ এবং লাভা উদগীরণ করেছিলো এই মাথুন দ্বীপের নাম না জানা পর্বতমালার শৃঙ্গটি কিন্তু আশ্চর্য, সে হঠাৎ এমন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলো কেন? সংজ্ঞা হারিয়ে পর্বতমালার অতল গহ্বরে পড়ে গিয়েছিলো কেন? কিছুই সে বুঝতে পারে না। তবে কি এই গুহার উপরিভাগে কোনো বিষাক্ত গ্যাস বা ঐ ধরনের কিছু ছিলো! হয়তো তাই হবে, নইলে অমন করে হঠাৎ মাথাটা ঝিম ঝিম করে দেহ অবশ হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো কেন?

বনহুর ভাবছে এখন যে স্থানে সে অবস্থান করছে সেখানে কোনো দূষিত গ্যাস বা ঐ ধরনের বিষাক্ত আবহাওয়া নেই। তবে মুক্ত বাতাস না থাকায় বনহুর অক্সিজেন মুখোশ খুলে ফেললো সে। সে সামনে এগুতে লাগলো।

ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে সে। বনহুর ভেবেছিলো ভেতরটা যতই কঠিন বা ভয়ংকর হোক ফিরে আসা তার জন্য মোটেই অসুবিধাজনক হবে না। কিন্তু তার সে চিন্তাধারা সঠিক নয়, বিস্ময়কর গুহা তাকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তুললো।

কতক্ষণ না কত ঘন্টা কেটেছে কিছু স্মরণ করতে পারছে না বনহুর। পৃথিবীর বুকে ফিরে আর যেতে পারবে কিনা তাও জানে না সে। বার বার মনিরার করুণ মুখখানা তার মনে পড়ছে। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রহমান ও জাভেদের কথাগুলো, তারা তাকে এই ভয়ংকর গহ্বরে নামতে বারণ করেছিলো। ক্যাপ্টেন হুইও কি রহমানের দলবলের সঙ্গে তারই জন্য প্রতীক্ষা করছেন? হয়তো ওরা চলে গেছে, মনিরা আর তার সঙ্গীরা নীরবে কান্নাকাটি করছে। এলোমেলো অনেক ভাবনা জট পাকিয়ে তুলছে তার মনে, কিন্তু এটা ভাববার সময় নয়। জায়গাও নয়।

বনহুর আরও এগুতে লাগলো।

টর্চের আলোতে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে সে। কোথাও বেশ উঁচু দেয়ালের কোথাও ফাটলের মত গভীর আবার কোথাও বা সমতল, দুপাশে দেয়াল।

হঠাৎ একটা শব্দ সে শুনতে পেলো। কান পেতে শুনলো বনহুর, শব্দটা ঝরনা বা জলস্রোতের মত শোনা যাচ্ছে।

বনহুরের চোখ দুটো আনন্দে জ্বলে উঠলো, ক্ষীণ আশা জাগলো তার মনে। নিশ্চয়ই কোনো জলস্রোত এই পর্বতমালার অভ্যন্তরে বেয়ে বাইরে চলে গেছে।

শব্দ লক্ষ করে এগুতে লাগলো সে।

টর্চের আলোতে চারদিক ঝকমক করছে। এত স্বর্ণ চারদিকে থরে থরে জমাট বেঁধে আছে। চোখ যেন ফোরানো যায় না। বনহুর মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে চেয়ে এগুচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর।

সত্যি একটি জলস্রোত তার পায়ের নিচে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

বনহুর জলস্রোতের ওপর টর্চের আলো ফেললো। সচ্ছ পরিষ্কার জলধারা কল কল করে বয়ে চলেছে। অসংখ্য স্বর্ণকণা ছড়িয়ে আছে জলধারার তলদেশে।

পিপাসার্ত বনহুর আজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে প্রাণভরে পান করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে সমস্ত ক্লান্তি-অবসাদ যেন দূর হয়ে গেলো। একটি পাথরখন্ডে হেলান দিয়ে বসলো বনহুর। কিছু সময় বিশ্রাম গ্রহণ করার পর আবার উঠে দাঁড়ালো সে তারপর জলস্রোত ধরে এগুতে লাগলো। টর্চখানা না থাকলে সে এই জমাট অন্ধকারে এক পাও এগুতে পারতো না। কারণ বড় অসমতল জায়গা; স্থানে স্থানে ফাটল রয়েছে।

জলস্রোত ধরে বহুক্ষণ চলার পর হঠাৎ সচ্ছ আলোর ছটা চোখে পড়লো বনহুরের। সূর্যের রশি বলে মনে হলো। বনহুর বিপুল আগ্রহ নিয়ে সেইদিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু আলোকরশ্মি কোন দিক থেকে আসছে ঠিক অনুধাবন করতে পারছে না। সামনে এগুচ্ছে বনহুর। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দেখলো একটা গভীর গর্তের মধ্যে জলরাশি পতিত হচ্ছে। সেই গর্তের উপরিভাগে একটা ফাটল রয়েছে। ঐ ফাটলের মধ্য দিয়েই সূর্যের রশ্মি ভেতরে প্রবেশ করছে।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। তার জীবনে এমন অবস্থা বহুবার এসেছে কিন্তু এমন বিস্ময়কর গুহা সে কোনোদিন দেখেনি।

বেশিক্ষণ ভাববার সময় নেই বনহুরের, সে উঠে আবার এগুতে লাগলো। টর্চের আলো ফেলে দেখছে চারদিকে। কয়েক পা এগুতেই হঠাৎ পা হড়কে বনহুর একটা ফাটলের মধ্যে পড়ে গেলো।

তারপর আর কিছু খেয়াল নেই।

মাথায় দারুণ আঘাত লাগায় জ্ঞান হারিয়ে ফেললো বনহুর। সে জানতে পারলো না কোথায় সে পড়লো।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন অনুভব করলো তার মাথাটা বড় ঝিম ঝিম করছে। চোখ মেলতেই আশ্চর্য হলো, সূর্যের আলো তার চোখে মুখে এসে পড়েছে। একটি

সমতল জায়গায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে।

উঠে বসলো বনহুর, মনে পড়লো সব কথা। সেই বিস্ময়কর গুহার মধ্যে চারদিকে স্বর্ণ আর স্বর্ণ। অদ্ভুত সে জলস্রোত, মধ্যে তার অসংখ্য ছোটবড় সোনার চেলা, টর্চের আলোতে ঝকমক করছিলো। পৃথিবীর অভ্যন্তরে এত সম্পদ লুক্কায়িত আছে কেউ তা কল্পনাও করতে পারে না।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার মুখের অক্সিজেন মুখোশ নেই, হাতের টর্চটা কোথায় পড়ে গেছে। শুধু কোমরের বেল্টে এখনও রয়েছে তার রিভলভারটা।

বনহুর বুঝতে পারলো, যে ফাটলের মধ্যে সে পড়ে গিয়েছিলো সেই ফাটলের মধ্যে ছিলো গভীর জলরাশি, আর ঐ জলরাশির স্রোতধারা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে বিস্ময়কর গুহার মধ্য হতে বাইরের পৃথিবীতে? জলস্রোতের ধারা এখন শান্ত, তবে কি জোয়ার-ভাটা রয়েছে। ভাটা পড়ায় তার দেহটা আটকে গেছে এই সমতল জায়গার উপরে? ঠিক তাই হবে, তার চারপাশে অসংখ্য স্বর্ণস্তর ছড়িয়ে আছে। প্রচন্ড জলস্রোতের সঙ্গে এই স্বর্ণখন্ডগুলো বেরিয়ে এসেছে। বনহুর হাতে তুলে নিলো পাথরের নূড়ির মত স্বর্ণখন্ডগুলো। দু'চোখে তার আনন্দ উপচে পড়ছে, গুহার ভেতর থেকে এখন সে বাইরের জগতে আসতে পেরেছে। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, ভাবছে মনিরা ও তার অনুচরদের কথা। তারা কি এখনও মাথুন দ্বীপে তার জন্য অপেক্ষা করছে। না সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেছে। আজ কদিন কেটে গেলো ঠিক খেয়াল করতে পারছে না বনহুর।

ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর বনহুর, তবে জলস্রোতের সচ্ছ পানি পান করে কিছুটা ক্ষুধা পিপাসা নিবারণ হয়েছে বটে তবুও ক'দিন সম্পূর্ণ অনাহারে তার দেহটা ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে আসছে।

বনহুর সেই জলস্রোত ধরে এগুতে লাগলো।

তাকে ফিরে যাওয়ার পথের সন্ধান করতেই হবে। মনিরা আর অনুচরদের জন্য বেশ চিন্তা হচ্ছিলো তবু ভরসা রহমান সঙ্গে আছে, মনিরাসহ ডুবুজাহাজে তারা কান্দাই সাগরে ফিরে যেতে পারবে। মনিরা ও অনুচরগণ তার জন্য ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বহুদূর এগিয়ে আসার পর বনহুর নিজকে বড় দুর্বল মনে করলো। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমান্বয়ে চারদিক ঝাপসা হয়ে আসছে। সম্পূর্ণ জনহীন প্রান্তর। পর্বতমালার পাদদেশ হতে অনেক দূর চলে এসেছে সে খরস্রোত জলধারার টানে। তারপর সে সারা দিন ধরে হাঁটছে, অনেক পথ সে হেঁটেছে। চারদিকে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম কিছুই নেই, শুধু প্রান্তর। জলস্রোত এখানে তীব্র, ক্রমে প্রশস্ত হয়ে জলধারা নদী আকারে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বনহুর লক্ষ করছে, এদিকে স্বর্ণকুচি বা স্বর্ণনূড়ি আর দেখা যাচ্ছে না। শুধু পাথর আর মাটির বুক চিরে সচ্ছ জলধারা বয়ে যাচ্ছে।

রাতের অন্ধকার জমাট হয়ে এলো, আকাশে দ্বাদশীর চাঁদ ভেসে উঠলো। অসংখ্য তারার প্রদীপ জ্বলে উঠলো নীল আকাশের বুকে। চাঁদ আর তারার মালা মিলে তাকে যেন অভিনন্দন জানাচ্ছে।

বনহুর তার রিভলভারখানা বের করে একটি গুলি ছুঁড়ে পরীক্ষা করে নিলো। হঠাৎ কোনো বিপদ এলে সে যেন নিজকে রক্ষা করতে পারে। রিভলভারখানা ঠিকই আছে, সেটা অকেজো হয়ে যায়নি।

অনেকটা আশ্বস্ত হলো বনহুর।

রাত বাড়ছে।

দু'চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে এলো।

বনহুর নদীর তীরে হাতের উপর মাথা রেখে চোখ বন্ধ করলো।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লো খেয়াল নেই তার।

সমস্ত রাত আরামেই কাটলো।

পরদিন।

চোখ খুলে উঠে বসলো বনহুর। অবাক হলো সে, আকাশে পাখি উড়তে দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা তার কাছে বড় আশ্চর্য লাগলো।

এটা কোন্ স্থান, যেখানে কোনো প্রাণী বাস করে না, এমন কি আকাশেও কোনো পাখি উড়তে দেখা যায় না। অনেক ভেবেও বনহুর কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না।

আবার চলতে শুরু করলো বনহুর।

নদীবক্ষে স্বচ্ছ জলধারায় নেমে মুখহাত ভালভাবে পরিষ্কার করে নিলো সে, আজলা ভরে পানিও পান করলো। এত ঠান্ডা আর পরিষ্কার পানি! বনহুর অবাক হলো।

আরো দুটো দিন অতিবাহিত হলো। মনিরা কেঁদেকেটে পাগলিনীয় হয়ে পড়লো। রহমান ও অন্য সবাই তাকে কোনো রকম সান্ত্বনা দিতে পারছিলো না। কিই বা সান্ত্বনা দেবে তারা, সর্দারের শোকে তারাও মূহ্যমান হয়ে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন হুই ও তার দলবল বিদায় হবার পর মনিরার অত্যন্ত খারাপ লাগছিলো। ওদের যাওয়া তার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হলেও বারণ করতে পারেনি মনিরা, কারণ তাদের থাকা আর সম্ভব ছিল না। তাই বিদায় মুহূর্তে সে হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিলো। ক্যাপ্টেন হুইকে গুরুজন বলে গ্রহণ করেছিলো মনিরা।

লুসিকেও ভাল লেগেছিলো মনিরার কিন্তু উপায় ছিলোনা ওদের ধরে রাখার। তাই মনকে সংযত করে নিয়েছিলো মনিরা জাভেদ আর ফুল্লরার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাছাড়া রহমান, মাহবুব আছে তার পাশে। অনেকটা সান্তনা পেলেও এখন সব সান্ত্বনা ভেসে গেলো, কারণ বনহুর আর ফিরে এলো না, নিশ্চয়ই তার মৃত্যু ঘটেছে। হয়তো বা ঐ গুহায় ভয়ংকর কিছু ছিলো যা তাকে গ্রাস করেছে।

মনিরা সেখানে দুই দিন, দুই রাত কাটানোর পর রহমান ও তার সঙ্গীদের ফিরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো।

রহমান বললো–তা হয় না বৌরাণী। সর্দারকে এই মৃত্যুভয়াল বিস্ময়কর গুহায় রেখে আমরা ফিরে যেতে পারি না। সবাই আমরা প্রতীক্ষা করবে তার জন্য।

বললো মনিরা-মিছামিছি প্রতীক্ষা করা। আর সে ফিরে আসবে না। কেন সে আমাদের বারণ শুনলো না! কেন সে ইচ্ছা করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলো। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো মনিরা।

রহমান এবার প্রস্তুত হয়ে নিলো, সে ঐ গুহায় প্রবেশ করবে। কিন্তু মনিরা কিছুতেই তাকে ঐ গুহায় প্রবেশ করার অনুমতি দিলো না। জাভেদও ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লো কিন্তু তাকেও গুহায় প্রবেশ করতে দিলো না মনিরা।

আরও একদিন কেটে গেলো।

মনিরা বললো–রহমান, তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও আমি একাই ওর প্রতীক্ষা করবো। তুমি ওদের নিয়ে ফিরে যাও রহমান।

তা হয় না বৌরাণী, তা হয় না। আপনাকে একা রেখে আমরা ফিরে যাবো এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন?

যাও তোমরা। না খেয়ে ফুলের মত মেয়ে ফুল্লরা মৃত্যুবরণ করবে। জাভেদ, জন, মাহবুব এরা সবাই দুর্বল হয়ে পড়ছে দিন দিন, তুমিও তো…

বৌরাণী, আমি সর্দারকে রেখে ফিরে যেতে পারি না।

তবে কি তোমরা সবাই ওর সঙ্গে জীবন বিসর্জন দেবে?

হাঁ, তাই করতে হলে করবো বৌরাণী।

ফুল্লরার কচি মুখ শুকিয়ে ম্লান হয়ে গেছে। বললো ফুল্লরা-সর্দার নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। সে মরতে পারে না। কত বিপদ তার জীবনে এসেছে, সে জয়ী হয়েছে। আমার মন বলছে সর্দার নিশ্চয় ফিরে আসবে।

কিন্তু আর কতদিন প্রতীক্ষা করবে ফুল্লরা? এদিকে যে আমাদের সঙ্গে খাবার বা পানি নেই। তোমরাও মারা পড়বে।

মনিরার অনুরোধে রহমান শেষ পর্যন্ত ফিরে যাওয়ার জন্য মনস্থির করে নিলো। এই দ্বীপে আর অপেক্ষা করা উচিত হবে না। মনিরাকেও সঙ্গে নিয়ে তারা ফিরে যাবে।

লর্ড ডাওনার ডায়ারীখানাই সর্বনাশের মূল, ওটা বিদায় মুহূর্তে ক্যাপ্টেন লুই রহমানের হাতে দিয়ে গেছে। রহমান যখনই একা বসে বসে ভাবে তখনই ঐ ডায়রীখানা পড়ে। বোঝার চেষ্টা করে, ঐ বিস্ময়কর গুহা থেকে বের হওয়ার

কোনো পথ বা উপায় আছে কিনা। হঠাৎ রহমানের নজরে পড়লো ডাওনা লর্ডের সেই গুহা সম্বন্ধে লেখাটা যে ক্ষুদে গুহায় সে লুকিয়ে রেখেছিলো মাথুন দ্বীপে পাওয়া মনিমুক্তাগুলো।

রহমান বললো–বৌরাণী, এই দেখুন ডায়রীর এক স্থানে আরও একটি গুহার সন্ধান দেওয়া আছে। ডাওনা লর্ড অতি সন্তর্পণে গুহার কথাটা লিখে রেখেছিলো,...

বৌরাণী, আপনি অনুমতি দিলে আমি ঐ মণিমুক্তাপূর্ণ গুহার সন্ধান করতে পারি।

মনিরা বললো–না জানি আবার তুমি সেই গুহায় গিয়ে ফিরে না আসে, তা হলে সবাই মরবে....

জাভেদ চুপচাপ শুনছিলো। সর্দার বিস্ময়কর গুহায় প্রবেশ করে আর ফিরে না আসায় সে যে না আসায় সে যেন মুষড়ে পড়েছিলো। ভাবছিলো কেন সর্দার ঐ মৃত্যুগহবরে প্রবেশ করলো। কেন তাকে সবাই যেতে দিয়েছিলো। কয়েকটা দিন কেটে গেলো ফিরে তো এলো না সর্দার। রহমান বা ফুল্লরার সঙ্গেও সে মন খুলে কথা বলে না। শুধু নির্জন স্থানে বসে বসে

রহমান আজ যখন নতুন এক গুহার সন্ধান মনিরাকে জানালো তখন সে চুপ থাকতে পারলো না। সে বললো রহমানকে সে যেতে দেবে না, সে নিজে যাবে সেই গুহায়।

এবং তখনই জাভেদ রহমানের হাত ধরে বললো–রহমান চাচা, তুমি আমাকে সেই গুহার পথ দেখিয়ে দাও, আমি যাবো সেখানে এবং যা চাও তাই নিয়ে ফিরে আসবো।

ফুল্লরা শুনে কেঁদে ফেললো-না না, তোমাকে যেতে দেবো না জাভেদ। তুমিও সর্দারের মত হারিয়ে যাবে, তোমাকে যেতে দেবো না আমি।

মনিরাও মত দিলো না। বললো–রহমান, কাজ নেই আর মণি মুক্তা নিয়ে। কিছুই চাই না, চলো ফিরে যাই আমার মামীমা আর নূরের কাছে। আমি জানতাম একদিন সে অমনি করে হারিয়ে যাবে আমাদের কাছ থেকে।

বৌরাণী!

হাঁ রহমান…বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কণ্ঠ।

কিন্তু রহমান ক্ষান্ত হয় না, সে খুঁজে বের করলো ডায়না লর্ডের সঞ্চিত মণিমুক্তাপূর্ণ সেই গুহা। প্রচুর মণিমুক্তা ডাওনা লর্ড সংগ্রহ করেছিলো। ঐ গুহায় কোন বিপদ ঘটলো না। রহমান আর জাভেদ কয়েক থলে পূর্ণ করে নিলো মণিমুক্তা আর স্বর্ণখন্ড।

তারপর চতুর্থ দিনে মনিরা চোখের পানি বিসর্জন করে ডুবুজাহাজের দিকে পা বাড়ালো। সঙ্গে রহমান, মাহবুব, ডুবোজাহাজ চালক জন এবং জাভেদ ও ফুল্লরা। অন্য অনুচররা থলেগুলো বহন করে নিয়ে চললো।

ডুবুজাহাজে পৌঁছতে আরও একটা দিন লেগে গেলো।

বনহুর কোথায় জানে না তারা, জীবিত না মৃত তাও জানে না। চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে তারা ডুবুজাহাজে পৌঁছলো।

মনিরা তার বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করে ডুকরে কেঁদে উঠলো মনিরা ভাবতে পারেনি মাথুন দ্বীপ তার প্রিয় স্বামীকে হরণ করবে। বনহুরের স্মৃতিগুলো মনিরাকে ব্যথিত কাতর করে তুললো। তার জামাকাপড়, তার ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র সব তাকে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছে, আমি নাইবা রইলাম তুমি তো রইলে। আমি তোমাদের সঙ্গেই তো আছি।

*

আরও কয়েকদিন কেটে গেলো।

বনহুর চলেছে সেই জলস্রোত ধরে। তীর বেয়ে এগুচ্ছে সে জলস্রোতের দু'ধারে নরম ঘাস এবং লতাগুল্ম পরিলক্ষিত হচ্ছে কোথাও ছোট ছোট ফুল আর ফলের গাছ।

কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছে বনহুর এতদূর এসেও কোনো লোকালয় বা পশুপাখী নজরে পড়ছে না। শুধু ঘাস আর আগাছা মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। এদিকে

জলস্রোত আরও প্রবল। মনে হচ্ছে জলস্রোত কোনো বৃহদাকার জলাশয়ে গিয়ে মিশেছে।

এদিকে সোনাদানা বা ঐ ধরনের কোনো কিছু নজরে পড়ছে না।

শুধু বালি আর মাটি।

আকাশ, বাতাস আর মিষ্টি হাওয়া।

সামনে সুধাসনা জলধরা, বনহুরের পিপাসা বোধ হলেই সে পানি পান করে। পানি পান করলে তার ক্ষুধা-পিপাসা, ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। আবার চলতে থাকে বনহুর, তার ভারী বুটখানা কাদা, মাটি আর বালি লেগে আরও ভারী হয়ে পড়েছে।

রাত নেমে এলে জলস্রোতের তীরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ভোর হলে আবার চলতে শুরু করে।

তার সঙ্গী ঐ রিভলভারখানা আর কিছু গুলি যা এখন তার একমাত্র ভরসা, বিপদের সঙ্গী।

মাঝে মাঝে ক্লান্তি দূর করার জন্য নীল আকাশের তলে শুয়ে শুয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশের দিকে। কত কি ভাবনা একসঙ্গে জট পাকায় তার মনে। মনিরা, রহমান এরা তার জন্য কি ভাবছে? তারা মনে করেছে নিশ্চয়ই তাদের সর্দার মৃত্যুবরণ করেছে। ক্যাপ্টেন হুই পরদিনই বিদায় গ্রহণ করবেন বলেছিলেন, তিনি কি চলে গেছেন? হয়তো তারা চলে গেছেন। শুধু রহমান ও তার দলবল রয়েছে। তারা প্রতীক্ষা করছে, নয় তারাও ডুবুজাহাজে ফিরে গেছে হতাশ হয়ে যদি গিয়েই থাকে তবে ভাল করেছে। অযথা মাথুন দ্বীপে অপেক্ষা করে তাদের কোনো লাভ হবে না। কান্দাই-আস্তানায় যারা আছে তারা জানে না, তাদের সর্দার এখন কোথায়। মুরী সন্তান জাভেদ আর ফুরাকে হারিয়ে পাগলিনীপ্রায় হয়েছিলো, এখন তার মনের অবস্থা কি কে জানে। মায়ের মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই তার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে, আর সে ভাবতে পারে না। আবার সে উঠে চলতে শুরু করে।

পা দু'খানা অবশ হয়ে আসছে যেন। আজ কদিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটছে তার। সঙ্গে কোনো খাবার নেই, শুধু জলস্রোতের সচ্ছ পানি পান করে জীবন কাটাচ্ছে সে। এই পানি না পেলে হয়তো তার জীবনের কোনো ভরসাই ছিলো না।

নীরবে এগুচ্ছে বনহুর।

এবার বনহুর খেয়াল করলো জলস্রোতের বেগ আরও বেড়ে গেছে। বনহুর অনুমান করলো জলস্রোত কোনো বড় জলধারার সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। একটা মেঘের গর্জনের মত শব্দ তার কানে ভেসে আসছে।

শব্দটা কিসের তা প্রথমে বুঝতে না পারলেও পরে ঠিকই অনুমান করতে সক্ষম হলো বনহুর। এ শব্দসমুদ্রের গর্জনের।

সন্ধ্যায় বনহুর এমন এক স্থানে এসে পৌঁছলো যেখানে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত দেহ বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেলো। বিশাল এক সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়েছে সে। সেই জলস্রোত এসে মিশেছে সমুদ্রের বুকে। আর এগুনোর উপায় নেই, পথ রুদ্ধ। তবে সমুদ্রের তীর ধীরে এখন বনহুর চলতে পারবে।

শুধু পানি আর পানি। প্রচন্ড প্রচন্ড ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছে তীরে পাথরগুলোর উপরে। আবার ফিরে যাচ্ছে সমুদ্রের অথৈ জলরাশির দিকে।

বনহুর বেশ চিন্তিত হলো।

কারণ সে এখন কোথায় কোন্ দেশে কিছু জানে না। অজানা অচেনা এ দেশ। জনমানবহীন এমন কি জীবজন্তু হীন এই দেশে। খাবার পানিও আর পাবে না সে। তবে কি এবার মৃত্যুবরণ করতে হবে? বনহুর মৃত্যুকে ভয় পায় না, তবে অপমৃত্যু তার কাম্য নয়।

এবার বনহুর সমুদ্রের তীর ধরে এগুতে লাগলো।

ভাবছে এই কি সেই সমুদ্র যে সমুদ্রের তলদেশে তার ডুবুজাহাজখানা তারই জন্য প্রতীক্ষা করছে। এ সমুদ্রের নাম কি তাও জানে না বনহুর। আকাশের দিক তাকালো কোনো পাখি আকাশে দেখা যায় কিনা। না কোনো পাখি নজরে পড়ছে, সচ্ছ আকাশ-মাঝে মাঝে দু'একখন্ড হাল্কা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে পাল তোলা নৌকার মত।

বনহুর সারা দিন সমুদ্রতীর ধরে এগুলো। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো পৃথিবীর বুকে। বনহুর বিশ্রামের জন্য একটা জায়গা বেছে নিলো।

রাত্রি কাটলো নানা চিন্তা আর ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে। অনেক কথাই মনে পড়ছে আজ বনহুরের। কত বিপদ তার জীবনে এসেছে, সব বিপদই হাসি-মুখে জয় করছে সে। হয়তো বা আজ জয়ী নাও হতে পারে। একদিন তার মৃতদেহ সমুদ্র তীরে বালুকা রাশির মধ্যে পড়ে থাকবে। খর রৌদ্রতাপে শুকিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে যাবে তার দেহটা। আকাশে চাঁদ উঠবে, চাঁদের আলোয় তার দেহটা বিকৃত দেখাবে। শিলায় শকুনি এখানে নেই যে তার গলিত দেহ খেয়ে তারা উদর পূরণ করবে। সামুদ্রিক কোনো জীব যদি বালুকারাশির উপর উঠে আসে তাহলে তার দেহটা তারা উল্লাস করে খেতো। না না তা হয় না, মা তার জন্য অহরহ কাঁদছেন, সে মরতে পারে না। তবে কি আবার কোনো দিন কান্দাই ফিরে যেতে পারবে সে।

পরদিন।

আবার চলছে বনহুর সমুদ্রের তীর ধরে।

বহুদূর সে এগিয়ে এসেছে।

হঠাৎ বনহুর আনন্দে চিৎকার করে উঠলো, দেখলো আকাশে পাখি উড়ছে, একটি দুটি নয় বেশ কয়েকটি পাখি আকাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে।

বনহুরের মনে খুশির উচ্ছ্বাস বয়ে গেলো। যদিও খুব দুরে আকাশের বুকে পাখীগুলো সাঁতার কাটছিলো তবুও তার আনন্দ লাগছে, দূরে বহু দূরে হলেও ওরা যেন তার সাথী। নিঃসঙ্গ একা তার বড় অসহ্য লাগছিলো, ওদের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পায় বনহুর।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতেই বনহুরের মনটা বিষণ্ণ হলো। নীল আকাশে উড়ে চলা পাখীগুলো একে একে কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেলো বুঝতে পারলো না বনহুর। পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে। ক্ষুধা আর পিপাসা তাকে ভীষণ কাতর করে ফেলেছে। পা আর চলতে চায় না।

বনহুর ভাবে, আবার যদি সেই স্বচ্ছ জলস্রোতের পাশে ফিরে যেতে পারতো। প্রাণভরে পানি পান করতো সে। কিন্তু তা কি আর সম্ভব বহুদূর চলে এসেছে

বনহুর। আর সেখান ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। কিন্তু আর যে পা চলছে না।

ভোর হয়ে এলো এক সময়।

হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো সমুদ্রের বুকে। চোখ দুটো তার আনন্দে নেচে উঠলো, একটা জাহাজ নজরে পড়লো তার। জাহাজখানা তীর ছেড়ে বেশ দূর দিয়ে যাচ্ছিলো।

বনহুর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো, তারপর দেহের জামাটা খুলে দক্ষিণ হাতে নাড়াতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বনহুর বুঝতে পারলো জাহাজখানা তার দিকে এগিয়ে আসছে। আশায় আনন্দে বনহুরের মন নেচে উঠলো। ওরা যে দেশেরই হোক তবুও তো মানুষ। নিশ্চয়ই জাহাজে খাবার এবং পানি আছে। প্রাণভরে পানি পান করবে। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ জানালো বনহুর।

জাহাজখানা তীর থেকে কিছুদূর এসে গতি কমিয়ে দিলো। এবার একটি ছিপনৌকা নামানো হলো জাহাজ থেকে। বনহুর সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সে বুঝতে পারলো ছিপূনৌকা নিয়ে ওরা তীরে আসবে এবং তাকে উদ্ধার করবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছিপনৌকা সহ দু'জন লোক তীরের কাছাকাছি এসে পড়লো। চমকে উঠলো বনহুর, লোক দু'জনের চেহারা সাধারণ নয়। সে অনুমান করলো এরা কোনো জলদস্যু বা ঐ ধরনের লোক হবে। বনহুর নিজকে সংযত করে নিয়ে, স্বাভাবিক হয়ে হাত বাড়ালো হ্যান্ডশেক করার জন্য।

লোক দু'জনের মুখ এবং দেহের যে স্থানগুলো জামার বাইরে ছিলো তাতে ভয়ংকর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। বনহুর হাত বাড়াতেই ওরা বললো–আমরা তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে আসিনি! কে তুমি? কি চাও?

লোকগুলো ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা বলছিলো।

বনহুরও ইংরেজীতে জবাব দিলো-আমি তোমাদের বন্ধুত্ব কামনা করছি। আমি একজন পথহারা পথিক, আমি তোমাদের সাহায্য চাই।

লোক দু'জন কোনো উত্তর না দিয়ে হাসলো, বিকৃত কুৎসিত সে হাসি। তারপর এরা দুজনে টেনে তুলে নিলো ওকে ছিপনৌকায়।

জাহাজখানার নিকটবর্তী হতেই বনহুর বুঝতে পারলো এমন এক জাহাজে সে আশ্রয় পাচ্ছে, যারা মানুষ নয় অমানুষ। কিন্তু কোনো উপায় নেই, তাকে ওদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে; বিশেষ করে বাঁচার তাগিদে।

ওদের ছিপনৌকাখানা এসে পৌঁছলো জাহাজটির পাশে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো অদ্ভুত ধরনের জাহাজখানা। ছিপনৌকাটি জাহাজের কাছে ভিড়তেই জাহাজের গায়ে একটি দরজার মুখ খুলে গেলো এবং সেই দরজা মুখ তাকে টেনে তুলে নেয়া হলো।

ছিপনৌকাখানাও উঠিয়ে নিলো ওরা।

বনহুরকে ওরা নিয়ে গিয়ে হাজির করলো একটা বড় ক্যাবিনে। ক্যাবিনে প্রবেশ করতেই নজরে পড়লো একজন ভীমকায় লোক একটি আসনে বসে আছে, তার যেমন বিকট চেহারা তেমনি মাথায় রাশিকৃত চুল। দুটো চোখ যেন আগুনের ভাটা, জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আর আশেপাশে কয়েকজন দাঁড়িয়ে এবং কয়েকজন বসে। সবার হাতে মদের বোতল।

বনহুর বুঝতে পারলো ঐ লোকটা দলপতি।

যে দু'জন লোক বনহুরকে সঙ্গে করে সেই ক্যাবিনে প্রবেশ করলে তারা তখনও বনহুরের দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দলপতিকে লক্ষ করে একজন বললো–এই লোকটাকে আমরা উদ্ধার করে আনলাম। এই সেই লোক যাকে আমরা জাহাজের ডেক থেকে দেখতে পেয়েছিলাম হুজুর।

দলপতি বনহুরের পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলো, তারপর বোতলের মদটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে বোতলটা এক জনের হাতে দিয়ে বললো– চেহারা দেখে মানুষ চেনা মুশকিল। ওকে দুদিন বিশ্রাম করার সুযোগ দাও, তারপর কাজে লাগানো যাবে। জাহাজের খোলের মধ্যে বন্ধ করে রাখো।

হুজুর, লোকটা ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে।

যাও খেতে দাও। তবে এখন মদ দেবে না। অভ্যাস না থাকলে অসুবিধা হবে।

আচ্ছা হুজুর।

লোক দু'জন যেভাবে তাকে এনেছিলো সেইভাবেই নিয়ে চলে গেলো। চলতে চলতেই বনহুরের নজরে যতটুকু পড়লো তা বিস্ময়কর। যা ভেবেছিলো তাই ঠিক এই জাহাজখানা জলদস্যু দলের। বনহুর ভাবছে তাকে সব মেনে নিয়ে চলতে হবে, জীবন রক্ষা পেলো তাই ভাগ্য। অনেক দিন আগের একটা ঘটনা তার মনে পড়ছে।

একদিন ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিলো তার জলদস্যুর সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলো সে।

যে ক্যাবিনে বনহুরকে আটক করে রাখা হলো সে ক্যাবিনটা জাহাজের তলদেশ হলেও একটি জানালা আছে বনহুর ঐ জানালা দিয়ে সব দেখতে পায়।

তাকে খাবার দিয়ে গেলো একটা বৃদ্ধ লোক।

বনহুর গোগ্রাসে খাবার খেলে এবং তৃষ্ণা মিটিয়ে পানি পান করলো। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো তাই তার কোনো দ্বিধা ছিলো না। খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো বনহুর।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে।

বনহুর নিজের ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো। মাথুন দ্বীপ ক্যাপ্টেন হুই ও তার দল, রহমান, মনিরা এবং জাভেদ ফুল্লরা, ডঃ ডাওনার সেই ডায়রীখানা। সবচেয়ে তাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে বিস্ময়কর গুহা। চাপ চাপ স্বর্ণ, স্বর্ণের স্তূপ। এই মুহূর্তে বনহুর যদি একখন্ড কাগজ আর কলম পেতো তাহলে মাথুন দ্বীপের বিস্ময়কর গুহার একটি ম্যাপ একে রাখতে। যেমন করে হোক ম্যাপ তাকে তৈরি করে রাখতেই হবে।

পরদিন বৃদ্ধ আবার তাকে খাবার দিতে এলো। বনহুর দরদভরা কণ্ঠে বললো– বুড়ো বাবা তুমি খুব ভাল লোক। তোমাকে দেখলে আমার বাবার কথা মনে হয়। বড় মায়া হয় তোমার জন্য...

বৃদ্ধ বনহুরের কথায় খুশি হলো।

তাকালো সে ভাল করে বনহুরের মুখের দিকে। তাদের দলের কেউ তো এমন করে কথা বলে না, সবাই লাথি আর কিল ঘুষি লাগায় যদি কোনো কাজে একটু বিলম্ব বা ত্রুটি হয়। একদিন সে এমন ছিলো না। তার দেহেও ছিলো বল। দস্যুতা করে বহু সম্পদ সে লুট করে আনতে। হাসি-হুঁল্লোড় আর ফুর্তি করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। দলের সবাই তাকে। ভয় করতো, সমীহ করতে। আর আজ শুধু অবহেলা আর তিরস্কার। কারণ পূর্বের মত এমন আর তার চাহিদা নেই। চোখেও তেমন দেখতে পায়না। দলপতি ওকে গুলি করে হত্যা করতে চেয়েছিলো, কেউ কেউ জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়ার জন্য দলপতির কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলো। বৃদ্ধ বয়সে সে যাবে কোথায়, তাই কান্নাকাটি করে দলপতির হাত পা ধরে রয়ে গেছে। এখন তার কাজ সবার খাবার পরিবেশন করা।

বৃদ্ধ বনহুরের কথায় সন্তুষ্ট হলো। ঘোলাটে চোখে তাকালো সে বনহুরের দিকে। কোন্ কথা তার মনে উদয় হলো কে জানে।

বনহুর আরও কিছুটা সরে বসলো ওর দিকে, বললো–বুড়ো বাবা, তোমার দেশ কোথায়?

বৃদ্ধ আনমনা হয়ে পড়লো, কিছু ভাবতে লাগলো সে গভীর মনোযোগ সহকারে। হয়তো বা জীবনের ঘটনাগুলো তার মানস পটে ভেসে উঠছে একটির পর একটি করে। একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে বেরিয়ে এলো। দৃষ্টি তার চলে গেলো ক্যাবিনটার দেয়ালে কিছু বলবার জন্য ঠোঁট দুটো তার নড়ে উঠলো।

বনহুর প্রতীক্ষা করছে।

বললো বৃদ্ধ—দেশ আমার কোথায় জানি না। ছোটবেলায় ছেলেধরা চুরি করে এনেছিলো, তারপর যখন আমার জ্ঞান হলো তখন থেকেই আমাকে চুরি করার কায়দা-কৌশল শেখানো হচ্ছিলো। প্রথম প্রথম একদম পারতাম না তাই আমার ওপর চালানো হতো অমানুষিক নির্যাতন } থামলো বৃদ্ধ, কথা বলতে বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলো সে।

বনহুর মনোযোগ সহকারে শুনছিলো বৃদ্ধের কথাগুলো।

অনেক দিন সে মানুষের সাথে কথা বলার সুযোগ পায়নি, একেবারে একা নিঃসঙ্গ ছিলো। শুধু দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এগুচ্ছিলো। যদিও সে এখন সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে আসেনি, এক ভয়ংকর অবস্থার জন্য তাকে প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে মনে মনে, তবুও তো কিছুটা পরিবর্তন এসেছে তার অসহনীয় নিঃসঙ্গতার মাঝে। বৃদ্ধের কথাগুলো তার বেশ লাগছিলো। বৃদ্ধ আবার বলতে শুরু করলো-আমার বয়স যখন তেরো কিংবা চৌদ্দ হবে তখন আমি এই অমানুষিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে সকলের অজ্ঞাত পালালাম। কিন্তু পালিয়ে পরিত্রাণ পেলাম না, ধরা পড়ে গেলাম আবার সেই দুস্কৃতিকারীদের হাতে।

বনহুর খাওয়ার কথা ভুলে গিয়ে শুনছিলো বৃদ্ধের কথাগুলো। বিস্ময় জাগছিলো তার মনে, যদিও এমন কাহিনী তার কাছে নতুন কিছু নয় তবুও যেন নতুনের স্বাদ পাচ্ছিলো বনহুর ওর জীবন কাহিনীর মধ্যে, বললো–বনহুর তারপর?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বৃদ্ধ বললো–এরপর আমার ওপর নির্যাতন আরও বেড়ে গেলো। আমাকে শুধু নয়, আমার মত আরও কিছু অল্পবয়সী ছেলেকে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো। আমার মতই তাদের ওপরও চলতো অমানুষিক নির্যাতন। অনেকে নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুবরণ করতো। কেউ কেউ পালিয়ে যেতো কিন্তু ধরা পড়ে গেলে আরও ভয়ংকর কষ্ট দিতো ওরা। তারপর আমার পরিণাম আরও কষ্টকর হলো। ঐ দুস্কৃতিকারিগণ ছোট ঘোট ছেলেদের চুরি করে এনে চুরিবিদ্যা শিক্ষা দিতে এবং বড় হলে তাদের বিক্রি করা হতো। গহন জঙ্গলে এবং পোড়াবাড়িতে আমাদের বন্দী করে রাখা হতো আর চুরির কৌশল শেখানো হতো। তারপর গ্রাহক আসতো আমায় খরিদ করার জন্য। দশ হাজার, বিশ হাজার এমনকি আরও বেশি মূল্যে আমাদের অসহায় ছেলেদের বিক্রি করা হতো। আমাকে একদিন দশ হাজার টাকায় বিক্রি করা হলো।

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলতে গিয়ে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো বৃদ্ধ লোকটা। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে। কথা বলতে গিয়ে বার বার তাকাচ্ছিলো সে ক্যাবিনের দরজার দিকে। হঠাৎ যদি কেউ এসে পড়ে তাহলে তার বিপদ হবে, হয়তো এই কারণে সে ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো বাইরের দিকে।

বনহুর বুঝতে পারে, অনেকদিনের জমে থাকা কথাগুলো ব্যথার চাপ হয়ে ছিলো ওর বুকের পাঁজরগুলোর মধ্যে। হঠাৎ সহানুভূতি মেশানো বাক্য তার

অন্তরের অন্তঃস্থলে উষ্ণ তাপের মত গিয়ে পৌঁছেছে, তাই তার বুকের ভেতরে এতদিনের জমে থাকা ব্যথার চাপ বরফগলা পানির মত বেরিয়ে আসছে বাধাহীন স্রোতধারার মত।

বনহুর বললো–বাবা, তুমি অনেক সময় এখানে কাটালে। হয়তো তোমার লোকজন খোঁজ করবে। এখন যাও, আবার যখন খাবার দিতে আসবে তখন সব শুনবো।

বৃদ্ধ বুঝতে পারলো লোকটা ঠিকই বলছে। বেশিক্ষণ তাকে না দেখলে চলে আসবে ওর এবং তাকে এখানে বসে গল্প করতে দেখে সর্দারের কাছে নালিশ দেবে তখন লাথি আর চড় তাকে হজম করতে হবে। বললো বৃদ্ধ–আচ্ছা আবার আসবো।

বেরিয়ে গেলো বৃদ্ধ দস্যুটা।

বনহুর ক্যাবিনের মেঝেতে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলো। ভাবতে লাগলো ঐ অসহায় বৃদ্ধটার কথা। সত্যি পৃথিবীটা কত নিষ্ঠুর। কারও কাছে পৃথিবী অপরূপ মনোরম আরও কারও কাছে পৃথিবী ভয়ংকর আর জঘন্য, কারণ এই পৃথিবীর বুকে চলেছে কত অন্যায় অনাচার অবিচার নিষ্পেষণ শোষণ। যারা নিষ্পেষণ শোষণ অন্যায় অনাচার করছে তারা পৃথিবীকে মনোরম স্বপ্নপুরী বলে মনে করছে, আর যারা নিষ্পেষিত শোষিত হচ্ছে তাদের কাছে পৃথিবীর রূপ জমাট অন্ধকারের মত ভয়ংকর। একই রক্তমাংসে গড়া এরা এবং ওর, কিন্তু কত পার্থক্য এই দুই শ্রেণীর মধ্যে।

হঠাৎ একটা তীব্র আর্তনাদ কানে এলো বনহুরের।

সজাগ হয়ে বসলো সে।

আর্তনাদের শব্দটা জাহাজের ডেক থেকে ভেসে আসছে। বনহুর উঠে দাঁড়ালো এবং ক্যাবিনের শার্শি দিয়ে তাকালো ডেকের দিকে। চক্ষুস্থির হলো বনহুরের। দুজন ভীষণ চেহারার লোক সেই বৃদ্ধটাকে প্রহার করছে। লাথি, কিল-ঘুষি বেদম চালাচ্ছে।

বৃদ্ধ কাতরভাবে হাত জুড়ে কিছু বলছে।

বনহুরের ধমনির রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো, এই মুহূর্তে ওদের সমুচিত শাস্তি সে দিতে পারে কিন্তু সে নিজকে অতি কষ্টে সংযত করে নিলো। এত সহজে বনহুর নিজের শক্তির পরিচয় দেবে না। বুঝতে পারলো কেন তার ওপর এ অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে। খাবার দিতে এসে সে বিলম্ব করছে এটাই তার অপরাধ আর নেই কারণেই তাকে এই অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে। অনুতপ্ত হলো বনহুর এবং মনের রাগ চেপে রাখলো সে অতি কষ্টে।

রাতে যখন বৃদ্ধ খাবার দিতে এলো তখন বনহুর ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত লক্ষ করে দেখলো, ঠোঁট কেটে ফুলে আছে। কপালের একপাশে ক্ষতচিহ্ন। দু'চোখে অসহায়ের দৃষ্টি।

বনহুর ওর হাত ধরে নিজের পাশে বসলো।

মাথায় পেটে হাত বুলিয়ে বললো–আমার কাছে অনেকক্ষণ ছিলে বলে তোমাকে ওরা খুব মারধোর করলো?

নীরব রইলো বৃদ্ধ।

বনহুর বললো–তুমি কষ্ট পেলে আমার জন্য। বুড়ো বাবা, তুমি আমাকে মারো। আমার জন্যই তোমার এ অবস্থা হয়েছে।

হাতের পিঠে চোখ মুছে বললো বৃদ্ধ–এ তো সামান্য, এর চেয়ে কত বেশি কষ্ট আমাকে সহ্য করতে হয়। সব আমার সয়ে গেছে বাবা, ছোট বেলা থেকে এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত শুধু দুঃখই করে গেলাম। সুখ কাকে বলে জানি না।

তোমার কি ছেলেমেয়ে কিছু নেই। বাড়িঘর কিছু নেই বাবা?

ওসব কিছু নেই। আর ওসব নেই বলেইতো এই কষ্ট সহ্য করে পড়ে আছি। আমার যাওয়ার কোনো জায়গা নেই...কোনো জায়গা নেই বাবা...একটা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললো–তুমি খেয়ে নাও। আমি ওদের খাবার দিয়ে আবার আসবো।

বৃদ্ধ বনহুরের সামনে খাবার রেখে বেরিয়ে গেলো।

বনহুর ওর চলে যাওয়া পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে খাবারের থালাটি টেনে নিলো

অনেক রাতে এসে বসলো বৃদ্ধ বনহুরের পাশে।

বনহুর উঠে বসলো। শান্তকণ্ঠে বললো–আবার এলে বুড়োবাবা?

তোমার কাছে না এলে শান্তি পাচ্ছিলাম না। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। দুদিন হলো এসেছে তারই মধ্যে তোমার জন্য আমার....

বুঝেছি বাবা। বলো সেদিন যা বলছিলে? আরে হ্যাঁ, এখন তোর আবার কোনো কাজ ফেলে আসোনি?

ওরা সবাই ফুর্তি করছে। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমি তো ওসব খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছি। বুড়ো বয়সে ওসব খেতে মন চায় না। তা ছাড়া আজ তিন-চার দিন আমাদের ভাগ্যে কোনো নতুন শিকার মেলেনি কিনা তাই সবাই....

নতুন শিকার? নতুন শিকার কি বুড়ো বাবা?

ও তুমি বুঝতে পারোনি? পারবে, পারবে, আর দুটো দিন কেটে যাক। শোনো, আমাদের জাহাজে এমন একটা চুম্বক মেশিন আছে, যার শক্তি ভয়ংকর। কোনো জাহাজ যদি হাজার মাইলের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে ঐ চুম্বক মেশিন জাহাজখানাকে আমাদের জাহাজের কাছে টেনে নিয়ে আসবে। আর রক্ষা নেই, আমাদের দলবল সেই জাহাজে আক্রমণ চালিয়ে সব মালামাল লুট করে নেবে।

বল কি বুড়ো বাবা!

হাঁ, দুটো দিন অপেক্ষা করে তাহলেই দেখবে, শুধু দেখবে নয় তোমাকেও আমাদের দলে যোগ দিয়ে কাজ করতে হবে।

তাই নাকি?

হাঁ, তোমার শরীর দুর্বল এবং তুমি একেবারে নতুন লোক তাই আমাদের দলপতি তোমাকে দু'চার দিন বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছে।

বনহুর অবাক হবার ভান করে বললো–আমি তো কোনোদিন এ সব কাজ করিনি, পারবো তো?

পারবে। তোমাকে ওরা শিখিয়ে নেবে, না পারলে রক্ষা নেই।

আমার কিন্তু বড় ভয় করছে তোমার কথা শুনে। সত্যি বুড়ো বাবা, আমি বড় দুর্বল, আমি কি এসব কাজ পারবোর

বললাম তো পারবে। তোমাকে সব মিশিয়ে নেওয়া হবে।

আজ পর্যন্ত কতগুলো জাহাজ তোমাদের চুম্বকমেশিন টেনে এনেছে বুড়া বাবা?

সে কি আর হিসেব আছে! বহু জাহাজ আমাদের শিকার হয়ে খতম হয়েছে।

এত ধনসম্পদ তোমরা রাখো কোথায়?

কালাপাহাড়ের গুহায়।

কালাপাহাড়! সে আবার কোথায়? আমি তো এমন নাম কোনোদিন শুনিনি বুড়ো বাবা?

দলে যখন এসেছো ভাগ্যক্রমে তখন একদিন কালাপাহাড় দেখবে। ঐ কালাপাহাড় ভুয়া সাগরের তীরে।

সব আমার কাছে বিস্ময়কর লাগছে। কালাপাহাড় ভুয়া সাগর, এসব কোথায়?

সাতদিন সাতরাত চলার পর আমাদের জাহাজ ভুয়া সাগরে পৌঁছবে, তারপর কালাপাহাড়। কোনো লোক সেখানে কোনো দিন যায়নি, যেতেও পারবে না।

আমার কিন্তু বড় দেখতে ইচ্ছে করছে।

খবরদার, ও কথা কোনো সময় মুখে আনবে না। তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে। কালাপাহাড়ে যে গুহায় আমাদের ধনসম্পদ থাকে, সে গুহা আমাদের দলপতি চিয়াংচু ছাড়া কেউ দেখেনি বা কোনোদিন কেউ প্রবেশ করেনি সে গুহায়।

আচ্ছা বুড়ো বাবা, তোমাদের সর্দার মানে দলপতি তাহলে কি চীন দেশের লোক?

আমি জানি না তবে তার নাম চিয়াংচু তাই জানি।

বনহুর চিন্তা করলো দলপতির সামনে যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তখন তার চেহারা দেখে চীনা বলেই মনে হয়েছিলো। কি ভয়ংকর দৈত্যের মত চেহারা। তবে তার পাশে আর একজন ছিলো যার চেহারা নিগ্রোদের মত। বনহুর অনেক কথাই কৌশলে জেনে নিলো, চুম্বক মেসিন বা যন্ত্র। নতুন শিকার, কালাপাহাড়, ভুয়া সাগর...এ আবার কোন দেশ আর কোন্ সাগর কে জানে। বিশাল পৃথিবীর অনেক দেশ অনেক রাজ্যের সন্ধানই জানে না অনেকে যেমন বনহুর নিজেও অবাক হচ্ছে নতুন স্থানের নাম জানতে পেরে।

বললো বনহুর–বুড়ো বাবা, তুমি আমাকে একখন্ড কাগজ আর কলম দিতে পারো? যদি তোমার কোনো অসুবিধা না হয়।

খুশিভরা গলায় বললো বৃদ্ধ–পারবো। আমার খাতা কলম আছে। আমি মাঝে মাঝে আমার দোস্ত রকিব ভোমকে চিঠি লেখি...তবে চিঠি কোনোদিন ছাড়া হয় না।

তার মানে?

মানে শুধু লিখি কিন্তু তার ঠিকানা জানি না। তাছাড়া এই সাগরের বুকে ভেসে বেড়াই...চিঠি পাঠানো আর হয় না।

রকিব ভোম? সে আবার কে?

আমার বন্ধু। বড় ভাল লোক ছিলো, ঠিক তোমার মত সুন্দর ছিলো ওর মন। কিন্তু সে কোথায় চলে গেছে, আমি আর তাকে খুঁজে পাই না। রকিব ভোম আর আমি এ জাহাজে একসঙ্গে এসেছিলাম। সে চলে গেছে আর আমি পড়ে রয়েছি।

বুড়ো বাবা, তুমি আমাকে কাগজ আর কলম দেবে বলেছিলে?

দেবো, আজই দেবো।

সত্যিই বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলো তারপর কাগজ আজ কলম নিয়ে ফিরে এলো। বনহুরের হাতে দিয়ে বললো–কলমটা আমাকে ফেরত দিও, কেমন?

দেবো। বসবে না বুড়ো বাবা?

না। ওরা আবার খুঁজবে, যাই।

বৃদ্ধ বেরিয়ে যায়।

বনহুর বৃদ্ধের দেওয়া কাগজ কলম নিয়ে বসলো। বনহুরের ক্যাবিনে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিলো না তাই একটা লণ্ঠন দেওয়া হয়েছিলো। ঐ লণ্ঠন জ্বেলে বসলো বনহুর। মনোযোগ সহকারে মাথুন দ্বীপের ম্যাপ আঁকলে, সেই পর্বতমালা, বিস্ময়কর গুহা এবং গুহার তলদেশে বিরাট ফাটল। যে ফাটলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জলস্রোত। বনহুর ঘন্টা কয়েক চেষ্টা করার পর ম্যাপখানা আঁকা শেষ করলো, তারপর সে তার জামার অভ্যন্তরে গোপন পকেটে সাবধানে লুকিয়ে রাখলো। বনহুর তপ্ত, ম্যাপখানা আঁকার সৌভাগ্য তার হয়েছে। মাথুন দ্বীপের বিস্ময়কর স্বর্ণগুহার সন্ধান সে ছাড়া আর কেউ জানে না।

গভীর রাত।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো বনহুরের।

সমস্ত জাহাজখানা যেন দুলছে। চিৎকার আর আর্তনাদে ভরে উঠেছে চারদিক। বনহুর এমন গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলো যার জন্য সে কিছু অনুধাবন করতে পারেনি।

বনহুর তার ক্যাবিন থেকে জানালাপথে দেখছে তাদের জাহাজের সঙ্গেই আর একটি জাহাজ থেমে আছে। এই জাহাজের লোকগুলো হই হুল্লোড় করে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে অপর জাহাজখানায়। সেকি কানফাটা আর্তনাদ আর চিৎকার-বাঁচাও বাঁচাও…সারাজাহাজে আর্তনাদ আর হাহাকার।

মশালের আলোতে চারদিক আলোকিত।

বনহুর সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। নৃশংস হত্যালীলা আর লুটতরাজ। জলদস্যু দলপতির ইংগিতে তার দলবল যাত্রীবাহী জাহাজখানাকে তচনচ করে ফেললে। তারপর এক সময় সবাই ফিরে এলো। সবার কাঁধে লুট করা ধনসম্পদ।

সবকিছু লুটতরাজ করার পর জাহাজখানাকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হলো, তারপর আনন্দধ্বনি করে উঠলো জলদস্যুদের দলপতি চিয়াংচু অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো, হঠাৎ বনহুরের চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা মুখ-চীনা দস্যু নাংচুহুয়াং-যে নরপশু আশাকে বন্দী করে রেখেছিলো তার গোপন গুহায়। সেই শয়তানের সঙ্গে এই চীনাদর হুবহু মিল আছে। তবে কি নাংচুহুয়াং নাম পাল্টে চিয়াং চু বলেছে। যদি নাং চু হুয়াংহু হয় তাহলে তার উপযুক্ত শাস্তি এবার সে পাবে।

বনহুর জলদস্যু চিয়াংচুর চেহারাখানার সঙ্গে নাংচুহুয়াহুর মিল খুঁজতে লাগলো।

আরও দুটো দিন কেটে গেলো।

বনহুরকে এবার দলপতি চিয়াংচুর সামনে হাজির করা হলো। তাকে চিয়াংচু তার কি কাজ বুঝিয়ে দিলে ভাল করে। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে কথা হলো তাদের। বনহুর চীনা ভাষা ব্যবহার করছিলো।

বনহুর যেন কিছু জানে না সেই ভাবে নিজেকে সরল সহজ মানুষটির মত করে কথাবার্তা বলছিলো। বললো–আচ্ছা আপনি যেভাবে বলবেন আমি তাই করবো।

বললো দলপতি–কি নাম তোমার?

বনহুর চট করে জবাব দিলো-আমার নাম সানহু।

সানহু! দলপতি নামটা একবার উচ্চারণ করলো।

এরপর থেকে বনহুরকে অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেওয়া শুরু হলো। কেমন করে আঘাত করতে হয়, কেমন করে হত্যা করতে হয়। কেমন করে লুটতরাজ করতে হয়, সব হাতেনাতে শিক্ষা চললো।

মৃদু মৃদু হাসে বনহুর।

দলপতি নিজে বনহুরের প্রতি খেয়াল রাখলো, কারণ তার ইচ্ছা বনহুকে দিয়ে সে অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারবে। তাই সে নিজেও মাঝে মাঝে বনহুরকে অস্ত্রচালনা শেখাতে লাগলো।

চিয়াংচু আর বনহুর মিলে অস্ত্রচালনা চলতো।

বনহুর চিয়াংচুর শিক্ষা অল্পেই শিখে নিচ্ছে তাই খুশি হয়েছে দলপতি, ওকে দিয়ে শক্ত কাজ করানো যাবে।

জাহাজ চলছে। একটানা শব্দ শুনতে শুনতে ভাবছিলো বনহুর, দলপতি চিয়াংচুর কথা। তাকে সে চিনতে না পারলেও বনহুর ওকে চিনেছে। ব্যাটা নাংচুহুয়াং নাম পাল্টে চিয়াংচু সেজে জলদস্যুতা করছে। হাজার হাজার অসহায় মানুষের জীবন নাশ করে তাদের সবকিছু হরণ করে নিচ্ছে। বনহুর অধর দংশন করে, রাগে সমস্ত মুখমন্ডলতার রাঙা হয়ে উঠলো।

নিজকে সংযত করে রাখলো বনহুর।

অবসর সময় সে যখন তার বিশ্রামকক্ষে এসে বসতো তখন বৃদ্ধ এসে বসতো তার পাশে। অনেক কথা হত উভয়ের মধ্যে। বৃদ্ধ তার জীবনের অনেক দুঃখজনক কাহিনী শোনাতো তাকে।

বনহুর শুনে যেতো।

কয়েক দিন ধরে জাহাজখানা সমুদ্রবুকে বিচরণ করে ফিরছে নতুন শিকারের আশায়।

ডেকে দাঁড়িয়ে চিয়াংচু দূরবীক্ষণ যন্ত্র চোখে লাগিয়ে সন্ধান করে ফেলে নতুন জাহাজের। এ পথে সহসা কোনো জাহাজ-আসে না। এলেই জলদস্যুর কবলে পড়ে সর্বস্বহারা হয়। ভুল করে কোনো জাহাজ এদিকে এসে পড়লে রক্ষা নেই।

সেদিন হঠাৎ একটা শব্দ কানে গেলো বনহুরের, একটা বাঁশি বা হুইসেলের শব্দ। বনহুর অবাক হয়ে একজন সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলো-ব্যাপার কি? এটা কিসের শব্দ।

বললো সঙ্গীটা–নতুন জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাই হুইসেল বাজিয়ে আমাদের সবাইকে সজাগ করে দিচ্ছে। তুমিও প্রস্তুত হয়ে নাও। আজ তোমাকেও আমাদের সঙ্গে কাজে নামতে হবে।

বনহুর অবাক হবার ভান করে তাকালো তার মুখের দিকে!

লোকটা একটা কষে চড় লাগিয়ে দিলো বনহুরের গালে, তারপর বললো–বেটা বোকারাম কিছু বোঝ না। সর্দার ক'দিন ধরে তোমাকে কি শেখালো? চলো, হা করে থাকলে চলবে না।

লোকটা বনহুরকে ধরে নিয়ে চললো সোজা চিয়াংচুর কাছে।

চিয়াংচু তখন চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দূরের জাহাজখানা লক্ষ করছে। বিরাট যাত্রীবাহী জাহাজ।

বনহুরকে দেখতে পেয়ে চোখের দুরবীণটা হাতে নামিয়ে রেখে বললো চিয়াংচু- অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দলের সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে নাও। জাহাজটা এগিয়ে আসছে। আমাদের চুম্বক মেসিন চালু করা হয়েছে-অল্পক্ষণেই চুম্বক টেনে নিয়ে আসবে জাহাজটাকে।

চিয়াংচুর কথাগুলো বনহুরের কানে পৌঁছলো বটে কিন্তু তার মধ্যে কোনো আগ্রহ সৃষ্টি হলো না।

বললো চিয়াংচু-কি হে, আমার কথা বুঝতে পারছে না?

বনহুর বললো–চুম্বক মেসিন! সে আবার কেমন জিনিস? যার এমন শক্তি যে, ঐ জাহাজখানাকে টেনে আনবে?

আসলে বনহুরের নিজস্ব জাহাজেও এ চুম্বক মেসিন আছে, কাজেই সে জানে চুম্বক মেসিনের কত শক্তি! তবুও বনহুর না জানার ভান করলো। অবশ্য তাকে ইচ্ছা করে কিছুটা বোকা বনে থাকতে হচ্ছে কিন্তু আর কতদিন এভাবে থাকতে হবে কে জানে!

জাহাজখানা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিকটবর্তী হলো।

অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলো চিয়াংচুর দলবল। এক একজন নরপশুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। জাহাজখানা নিকটবর্তী হতেই চিয়াংচু তার প্রধান অনুচরকে নিয়ে ডেকের সম্মুখভাগে এসে দাঁড়ালো।

বনহুরকেও সবার সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে নিতে বললো চিয়াংছ।

বনহুর অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হলো বটে কিন্তু এ অস্ত্র সে চিয়াংচুর বুকে বসিয়ে দেবে কিনা ভাবছে।

জাহাজখানা একেবারে কাছে এসে পড়েছে।

চিয়াংচুর দল লম্বা কাটাযুক্ত হাতল নিয়ে তৈরি হলো। জাহাজখানা নিকটে আসতেই লম্বা হাতল দিয়ে জাহাজটাকে আটকে ফেললো নিজেদের জাহাজখানার সঙ্গে এবং সবাই ঝাঁপিয়ে পড়লো এ জাহাজের ওপর। শুরু হলো তুমুল লড়াই, কাট কাট মার মার শব্দ। তীব্র আর্তনাদে ভরে উঠলো সমুদ্রবক্ষ।

বনহুরও সবার সঙ্গে যাত্রীবাহী জাহাজখানায় নেমে পড়েছিলো। সবাই যখন যাত্রীবাহী জাহাজখানার যাত্রীদের নির্মমভাবে হত্যা করছে তখন বনহুর কুদ্ধভাবে তাকাচ্ছিলো চিয়াংচুর অনুচরদের দিকে। কারণ এরা নির্দোষ অসহায় মানুষ। বনহুর নিজেও বহু হত্যা করেছে কিন্তু সে কোনোদিন কোনো নিরীহ মানুষের বুকে অস্ত্রবিদ্ধ করে না যারা নিরীহ জনগণের রক্ত শোষণ করে, যারা অন্যায় অনাচারে লিপ্ত বনহুর তাদের যমদূত। অসহায়ের বন্ধু সে। বনহুর বুঝতে পারলো এটা যাত্রীবাহী জাহাজ এবং এ জাহাজের যাত্রীরা সাধারণ নারী-পুরুষ। এরা ভাবতেও পারেনি এমনভাবে তাদের জীবন দিতে হবে। নিশ্চিন্তভাবে যাত্রিগণ জাহাজের বিভিন্ন ক্যাবিনে, ডেকে এবং খোলের মধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলো। হঠাৎ জলদস্যর কবলে তাদের জাহাজ আক্রান্ত হবে ভাবতে পারেনি কেউ। এখন সবাই প্রাণভয়ে আর্তনাদ করছে।

হঠাৎ বনহুর ফিরে তাকালো।

সে দেখতে পেলো চিয়াংচুর একজন অনুচর একটি বৃদ্ধার কণ্ঠ থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নিচ্ছে। বৃদ্ধা দু'হাত জোড় করে বলছে, বাবা সব নাও তবু আমার স্বামীকে প্রাণে মেরো না…

অপর একজন সেই বৃদ্ধার স্বামীর বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়ার জন্য উদ্যত হয়েছে। বৃদ্ধা চিৎকার করে কাঁদছে, চারদিকে আর্তনাদ। বনহুর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারে না, সে দ্রুত এগিয়ে চিয়াংচুর অনুচরটির দক্ষিণ হাতে মোচড় দিয়ে ধরলো, তারপর বসিয়ে দিলো এক ঘুষি।

চিয়াংচু অদূরে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য লক্ষ করলো। সে তার সহচরদের লক্ষ্য করে বললো—সানহুকে আটক করো? ঐ দেখো সে আমাদের বিরোধিতা করছে...যাও আটক করো...

সঙ্গে সঙ্গে বনহুরকে তারা ঘিরে ধরলো এবং তার বুকের কাছে পিস্তল ধরে নিয়ে চললো চিয়াংচুর জাহাজে।

বনহুরকে যখন ওরা পাকড়াও করলো তখন বৃদ্ধা তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো। তার পরপরই লুটিয়ে পড়লে তার রক্তাক্ত দেহটা। বনহুর বুঝতে পারলো বৃদ্ধা ও তার স্বামী বৃদ্ধকে ওরা হত্যা করলো রাগে-দুঃখে বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

চিয়াংচুর অনুচরগণ বনহুরের চারপাশে অস্ত্র ধরে তাকে নিয়ে এলো, এবং একটা ক্যাবিনে বন্দী করে রাখলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীবাহী জাহাজখানা তচনচ্ করে হত্যা ও লুটতরাজ শেষ করে ফিরে এলো সবাই।

যাত্রীবাহী জাহাজখানাকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো মাঝ দরিয়ায়। সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। বনহুরকে চিয়াংচুর দল বন্দী করেই ক্ষান্ত হলো না, তার ওপর চালানো হলো নির্মম অত্যাচার।

চিয়াংচুর সামনে হাজির করে চাবুক মারা শুরু করা হলো বনহুরের দেহে। কেন সে বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গেলে এটাই তার অপরাধ এক একটা চাবুকের আঘাত বনহুরের দেহের রক্ত জমাট করে কালো রেখা সৃষ্টি করছিলো।

বনহুরের আসল পরিচয় যদি তারা জানতো তাহলে চিয়াংচুর হৃদকম্প শুরু হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়তো বা অহংকারে ওর বুক ভরে উঠতো, দস্যু বনহুরকে সে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে। হয়তো বা চিয়াংচু তাকে নিজ হাতে হত্যা করে নিজেকে বীরশ্রেষ্ঠ মনে করতো। কিন্তু চিয়াংচু জানে না তাকে তারা একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে নিজেদের দলে নেবার জন্য নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে সে ব্যক্তি কে।

চিয়াংচু নির্যাতন চালানোর পর বললো—বলো সানহু, আর এমন কাজ করবে না? বলল করবে না?

বললো সানহু বেশি বনহুর–ঠিক আছে।

এর বেশি কিছু বললো না সে।

নির্যাতন বন্ধ হলো তবে আবার চললো প্রশিক্ষণ। চিয়াংচুর প্রধান অনুচর তাকে হাতেনাতে শিক্ষা দিতে লাগলো। একদিন প্রশিক্ষণ শেষে বনহুর নিজের ক্যাবিনে ফিরে যাচ্ছিলো, এমন সময় দেখতে পেলো বুড়ো বাবাকে একজন অনুচর কিল, ঘুষি আর লাথি মারছে।

বনহুরের রাগ হলো এবং মুহূর্ত বিলম্ব না করে যে লোকটা বুড়ো বাবাকে কিল ঘুষি আর লাথি লাগাচ্ছিলো তার গলা টিপে ধরলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার চোয়ালে।

লোকটা আচমকা ঘুষি খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বলিষ্ঠ জোয়ান এবং শক্তিশালী অনুচর সে। বনহুরের ঘুষি খেয়ে সে বিস্মিত হলো; পাল্টা ঘুষি লাগানোর সাহস তার হলো না। ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দলপতির ক্যাবিনের দিকে চলে গেলো।

বনহুর বুড়ো বাবার হাত ধরে নিজের ক্যাবিনে নিয়ে এলো। বুড়ো বাবা তখন কাঁপছে, বললো সে-সানহু, তুমি আমার জন ওকে মারলে কেন? সে দলপতির কাছে সব বলে দেবে, তোমাকে দলপতি মারবে।

হাসলো বনহুর। বুড়ো বাবার কথা সে কানেই নিলো না।

বুড়ো বাবা ভীষণ ভীত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলো। প্রতি মুহূর্তে সে দলপতির কঠিন আঘাতের কথা স্মরণ করছে। কেন সানহু তার জন্য ওকে মারলো, কেন এমন কাজ করলো।

এখানে বুড়ো বাবা যখন তার সন্তানসম সানহুর জন্য ভাবছে তখন সেই ভীমকায় শক্তিশালী অনুচরটি গিয়ে দলপতি চিয়াংচুর কাছে নালিশ জানালো। সানহু তাকে ঘুষি লাগিয়ে দাঁত-মুখ ভেঙে দিয়েছে। তার নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে। চিয়াংচু লক্ষ করলো সব।

চিয়াংচুর চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো। সানহুর দেহে এত শক্তি যে তার সবচেয়ে শক্তিশালী অনুচরটির নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরিয়ে ছেড়েছে। মনে মনে

অবাক হলো, রাগও হলো সানহুর ওপর। বললো–এর পর আবার যদি সে তোমার বা আমার আর কোনো অনুচরের প্রতি এ রকম ব্যবহার করে তাহলে তাকে হাত পা বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে।

অনুচরটি চিয়াংচুর কাছে বিমুখ হয়ে ফিরে গেলো। কিন্তু তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো সানহুর ওপর সুযোগ পেলেই সে সানহুকে দেখে নেবে, ওর দেহে কত শক্তি আছে!

চিয়াংচু এরপর থেকে সানহুকে কিছুটা সমীহ করে চলতে লাগলো। এমন একজন তাদের দলে থাকা দরকার বলে মনে করলো সে।

মাঝে মাঝে চিয়াংচু সানহুর সঙ্গে আলাপ করতো, অস্ত্র শিক্ষা দিতে এবং মদ খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে।

বনহুর চিয়াংচুর মনোভাব বুঝতে পারে। সে গম্ভীর ভাবে জানিয়ে দেয় মদ সে খায় না।

চিয়াংছু তাকে আর পীড়াপীড়ি করে না।

আরও কয়েকটা দিন বেশ কাটলো। তেমন কোনো জাহাজের সন্ধান পাওয়া না যাওয়ায় চিয়াংচু কালাপাহাড়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

বুড়ো বাবার মুখেই এ সংবাদটা পেলো বনহুর।

একটা গোপন বাসনা উঁকি দিলো বনহুরের মনে। ভুয়াসাগর, কালাপাহাড় এসব নাম তার জানা নেই। তবে বুড়ো বাবার মুখেই শুনেছে চীন সাগর অতিক্রম করে ভুয়া সাগরের মোহনায় পৌঁছানো যায়।

বনহুর নিজকে সংযত রেখে সাবধানে এদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগলো।

*

নূর হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করতেই একটা ছায়ামূর্তি সরে গেলো পর্দার আড়ালে।

নূর না দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে সোফায় বসে পড়লো। তাকালো সে দেয়াল ঘড়িটার দিকে। এখন রাত বারোটা দশ মিনিট।

বন্ধু আরফানকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। টেবিলে খাবার ঢাকা দিয়ে বড় ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। নূর টেবিলের দিকে তাকালো, মনে মনে ভাবছে তার প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে কেউ এই কক্ষে ছিলো এবং তার পদশব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কে সে।

কদিন মরিয়ম বেগম ছিলেন।

মায়ের জন্য সর্বক্ষণ নূর ব্যস্তসমস্ত হয়ে নানা জায়গায় সন্ধান চালিয়ে চলেছে। নাওয়া খাওয়া এক রকম প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। নূর ঠিক সময়মত বাসায় ফেরে না, কত জায়গায় তাকে যেতে হয় নানা ছদ্মবেশে, নানাভাবে।

নূরের স্বাস্থ্য দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। চাকর আর বাবুর্চির ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি মরিয়ম বেগম, তাই তিনি এখানেই ছিলেন। লক্ষ রাখতেন যতক্ষণ নূর বাসায় থাকতো ততক্ষণ তার ঠিকমত নাওয়া খাওয়া যেন হয়। হঠাৎ মরিয়ম বেগম কোনো প্রয়োজনে চৌধুরীবাড়িতে গেছেন। রাতটুকু-চৌধুরী বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকালেই ফিরে আসবেন। একমাত্র নাতি নূরের জন্য তার চিন্তার শেষ নেই। মনিরার নিরুদ্দেশ ব্যাপারটা শুধু চৌধুরীবাড়ির লোকজনদেরই ভাবিয়ে তোলেনি, পুলিশমহলকেও ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে।

স্বনামধন্য পুলিশ সুপার মিঃ আহমদ এবং তার সহকারিগণ অত্যন্ত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। সমস্ত শহর তন্ন তন্ন করে তল্লাশি চালিয়েও মনিরার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। তরুণ ডিটেকটিভ নূর ভেঙে পড়েছে। মায়ের জন্য তাকে এভাবে ভাবতে হবে তা কোনোদিন কল্পনাও করেনি নূর। সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছে, যে তার মাকে হরণ করেছে তার বিরাট কোনো স্বার্থ আছে এবং সেই চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই এ কাজ সে করেছে।

নূরকে সর্বান্তকরণে সর্বতোভাবে সহায়তা করে চলেছে তার বন্ধু আরফান। ধনবানের পুত্র আরফান বন্ধু নূরের ব্যথা অন্তর দিয়ে অনুভব করে, তাই সে নানা ভাবে নূরকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে।

শুধু আরফান নয়, পুলিশ সুপার মিঃ আহমদও মনিরার নিখোঁজে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সমস্ত শহরে গোয়েন্দা বাহিনী ছদ্মবেশে খোঁজখবর এবং তল্লাশি চালিয়ে চলেছে। মিঃ আহমদ নিজেও নিশ্চুপ নেই।

নূর কিন্তু অনেকটা শান্ত নিশ্চুপ হয়ে পড়েছে।

মিঃ বি, কে, চৌধুরীর গোপন বৈঠকের আলোচনায় সে জানতে পেরেছিলো তার মা তার আব্বুর পাশেই আছে এবং এমন কোনো গোপন স্থানে তাদের আটক করে রাখা হয়েছে যেখানে কেউ তাদের সন্ধান পাবে না। কথাটা নূর পুলিশ মহলে ব্যক্ত না করলেও বন্ধু আরফানের নিকটে বলেছে।

আরফান সেদিন নূরের কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়নি। কারণ পূর্ব হতেই তার ধারণা ছিলো বি, কে, চৌধুরীই নূরের মাকে সরিয়েছে এবং নূরকে শায়েস্তা করাই হলো বি, কে চৌধুরীর মূল উদ্দেশ্য।

নূর সব কথা খুলে বললেও তার আব্বুই দস্যু বনহুর তা সম্পূর্ণভাবে চেপে গেছে। সে দস্য বনহুরের সন্তান এ কথা পুলিশ মহলের অনেকেই জানলেও আরফান জানে না এখনও।

নূর বোবার অভিনয় করে বি, কে চৌধুরীর গোপন আড্ডাখানায় ছিলো এবং তাদের গোপন আলোচনায় সব জেনে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। কিন্তু কোথায় সে স্থান তা নূর জানতে পারেনি। বি, কে, চৌধুরী অন্তর্ধান হবার পূর্বেই তাকে নূর স্বহস্তে হত্যা করেছিলো।

আজ কদিন ধরে নূর ও আরফান বিভিন্ন স্থানে গোপনে সন্ধান চালিয়ে চলেছে। কিন্তু কোনো খোঁজখবরই পায়নি সে। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলো নূর আরফানকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে। আজ দাদীমা বাসায় নেই, তার বাড়ি ফিরতে রাত হয়েছে বলে কেউ তাকে বকাঝকা করবে না। হতাশভাবে শিথিল পা দু'খানা টেনে টেনে কক্ষে প্রবেশ করেছিলো নূর।

দরজার পর্দা সরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতেই কেউ অলক্ষ্যে দ্রুত সরে গেলো, বেশ বুঝতে পারে নূরে। সে প্যান্টের পকেটের ওপরে হাত দিয়ে রিভলভারখানার অস্তিত্ব অনুভব করে নিয়ে সোফায় দেহখানা এলিয়ে দেয়।

আড়ালে আত্মগোপন করে কেউ তাকে লক্ষ করছে।

কিন্তু কে সে নূর নিজকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলো। যে কোনো মুহূর্তে তার ওপর আক্রমণ আসতে পারে, কিন্তু কি ধরনের আক্রমণ আসবে তা সে বুঝতে পারে না। নূর ভাবলল সে বয়কে ডাকবে, খাবার দেওয়ার জন্য। পরক্ষণেই মনে হলো, না, তাতে আরও ক্ষতি হতে পারে, কারণ যে আড়ালে আত্মগোপন করে আছে, সে তাকে ভালভাবে লক্ষ করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নূর উঠে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ পর্দা ঠেলে পাশের রুমে প্রবেশ করলো, কিন্তু আশ্চর্য হলো, রুমে কেউ নেই। কিছু পূর্বেই নূর লক্ষ করেছে কেউ যেন তার প্রবেশের পূর্বেই সরে পড়লো দ্রুতগতিতে। কিন্তু কে সে? আর গেলোই বা কোথায়? নূর প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে খুঁজতে লাগলো। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো টেবিলে ফুলদানির তলায়। একখন্ড সবুজ রঙের কাগজ চাপা দেওয়া আছে।

নূর কাগজখানা হাতে তুলে নিয়ে লাইটের আলোতে মেলে ধরলো। তাতে লেখা আছে মাত্র দুটি লাইনঃ

তোমার মা ফিরে এসেছে। এখন সে কান্দাই সাগরের তলদেশে বনহুরের ডুবুজাহাজে।

–মাদাম বাঈ।

নূরের দু'চোখ আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। একবার দুবার কয়েক বার পড়লো নূর। তারপর খেয়াল হলো মাদাম বাঈ...সেই মাদাম মাঈ যে বি, কে, চৌধুরীর সহকারী পার্টনার আহসান হাবীবকে হত্যা করেছিলো। তারপর সকলের অলক্ষ্যে সরে পড়েছিলো। সেই মাদাম বাঈ...কিন্তু কে সে? কি তার পরিচয়? নূর গভীর মনোযোগ সহকারে ভাবতে লাগলো। তার মনে আজ একটি আশার আলো জ্বলে উঠলো, মাদাম বা যেই হোক তার হিতাকাঙ্ক্ষী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার মায়ের সংবাদটা তাকে জানানোর জন্যই কৌশলে এই বাংলোয় উপস্থিত হয়েছিলো সে। কিন্তু এমন গোপনে আসার কি প্রয়োজন ছিলো তার? এলোই যখন তখন চলেই বা গেলো কেন? আর কোন্ পথে সে বেরিয়ে গেলো? আশ্চর্য বটে...নূর ভাল করে তাকালো জানালাটার দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে নূরের মনে হলে গাড়ি বারান্দায় একটি গাড়ি এসে থামলো।

নূর কিছুটা অবাক হলো, এত রাতে কে এলো।

জানালা খুলে নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই নূর দেখতে পেলো কেউ যেন তার বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো এবং গাড়ির দরজা খুলে পেছন আসনে চেপে বসলো।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়িখানা বেরিয়ে গেলো দ্রুতবেগে।

নূরের মনে হলো গেট খোলা ছিলো এবং অনায়াসে কেউ গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তবে কি মাদাম বাঈ স্বয়ং এসেছিলো তাকে এ সংবাদটা জানাতে? কিন্তু কে এই মাদাম বাঈ...তার প্রতি হঠাৎ এমন সদয় আচরণেরই কারণ, বা কি? নূর বিছানায় গা এলিয়ে দিলো। সে বুঝতে পারলো মাদাম বাঈ সাধারণ কোনো মেয়ে নয়, তার মা ডুবুজাহাজে আছে এবং সে জাহাজ এখন কান্দাই সাগরের তলদেশে অবস্থান করছে-সব জানে মাদাম বাঈ।

নূর আজ নিশ্চিন্ত হলো-তার আব্বুর ডুবুজাহাজে মা অবস্থান করছেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই, মাদাম বাঈ-এর কথা সত্য।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত দুটো বাজার সংকেতধ্বনি হলো পাশ ফিরে ঘুমালে নূর।

*

কোচওয়ানের বেশে রহমান মনিরাকে নিয়ে চলেছে। গাড়িখানা এগিয়ে যাচ্ছে বড় সড়ক ধরে হিরাঝিলের পাশ কেটে। গাড়ীর ভেতরে মনিরা। রহমান কোচবাক্সে বসে অশ্ব চালনা করছে। যদিও তার একটি হাত নেই তবুও অশ্ব বগা টেনে ধরে রেখেছে। ঘোড়ার গাড়ির চাকার একটানা শব্দ হচ্ছে ঘর ঘর ঘর।

এমন সময় পথ আগলে দাঁড়ালো এক সাধক বাবাজী। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে চিমটা, ললাটে চন্দনা আলপনা। বললো–ভিক্ষা দাও, নইলে পথ ছাড়বো না।

রহমান বললো–পথ ছাড়ো আমাদের সঙ্গে ভিক্ষা দেবার মত কিছু নেই।

সাধক বাবাজী কাতর কণ্ঠে বললো–কিছু দান না করলে আমি পথ ছাড়বো না। আমি কিছু চাই।

রহমানকে লক্ষ্য করে বললো মনিরা-কোচওয়ান একটু অপেক্ষা করো। সাধক বাবাজীকে কিছু দান করবো।

মনিরার কথায় কোচওয়ান-বেশি রহমান গাড়ি থামিয়ে ফেললো।

এবার মনিরা গাড়ীর দরজা খুলে বললো–এসো, সাধু বাবাজী, এই নাও।

সাধক বাবাজী দরজার দিকে এগিয়ে গেলো।

মনিরা নিজের হাতের একগাছা স্বর্ণ বলয় খুলে সাধকের হাতে দিয়ে বললো–এই নাও সাধাক বাবাজী, আশীর্বাদ করো বাড়ি ফিরে আমার সন্তানকে যেন সুস্থ দেখতে পাই।

হাত বাড়িয়ে সাধক বাবাজী মনিরার স্বর্ণবলয়খানা গ্রহণ করলো, তারপর পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো সাধক বাবাজী।

রহমান গাড়ি চালিয়ে অগ্রসর হলো।

চৌধুরীবাড়ির সামনে গাড়িখানা পৌঁছতেই আড়াল থেকে হুইসেলের শব্দ শোনা গেলো, সঙ্গে সঙ্গে একদল পুলিশ ফোর্স ঘোড়ার গাড়িখানাকে চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেললো। সবার হাতেই আগ্নেয় অস্ত্র।

পুলিশ সুপার মিঃ আহমদের নির্দেশে রহমানকে গ্রেপ্তার করা হলো। তাকে পুলিশ হাজতে প্রেরণ করার জন্য প্রস্তুতি নিলো।

মনিরা মিঃ আহমদকে বললো–ওর কোনো অপরাধ নেই। আমাকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিলো তারা অন্য লোক, তাদের কেউ থাকলে আমাকে পেতেন না। তারা নেই, আর নেই বলেই এরা আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে নূর ছুটে এলো গাড়ি নিয়ে।

মাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দধ্বনি করে বললো নূর–আম্মি, তুমি ফিরে আসবে আমি জানতাম।

এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কে তোমাকে আটকে রেখেছিলো। নূর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললো।

মনিরা বললো–সব বলবো বাবা, সব বলবো। কোচওয়ান একজন মহৎ ব্যক্তি, তার কোনো অপরাধ নেই। হতো তাহলে আমাকে তার নিজের গাড়িতে বয়ে নিয়ে আসতো না।

মনিরা বেগম আনন্দে কেঁদেই ফেললেন, তিনি বৌমাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন-আমি হারানো মানিক পেলাম। জানো বৌমা, নূর, তোমার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলো। সমস্ত দিন তোমার সন্ধান করে ফিরতে, নাওয়া খাওয়া একেবারে বিসর্জন দিয়ে ছিলো।

মামীমার কথায় মনিরার চোখ অশ্রু ছলছল হয়ে উঠলো। একটা দারুণ গোপন ব্যথা বুকে চেপে মুখে হাসি ফোঁটাবার চেষ্টা করলো সে।

মায়ের মুখোভাব মরিয়ম বেগম লক্ষ না করলেও, নূরের দৃষ্টি এড়ালো না।

পুলিশ সুপারের সঙ্গে মনিরার কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনা হলো। মিঃ বি, কে, চৌধুরী মনিরাকে কিভাবে সকলের অজ্ঞাতে সাধুতার মুখোশ পরে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো, কোথায় কোন অজানা গোপন স্থানে বন্দী করে রেখেছিলো সব মনিরা সংক্ষেপ বললো।

মিঃ আহমদ গভীর মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন, তিনি বললেন পুলিশ মহলের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। এমন কি আপনার সন্তান যার কলা কৌশল সুচতুর দুষ্কৃতকারীদের নাকানি চুবানি খাইয়ে ছাড়ছে সেই প্রখ্যাত তরুণ গোয়েন্দা মিঃ নূরুজ্জামানও ব্যর্থ হলেন তার মায়ের সন্ধান জানতে। এমন কে সেই ব্যক্তি যে আপনাকে উদ্ধার করে আনতে সক্ষম হয়েছে বলুন মিসেস মনিরা?

মনিরা কোনো জবাব দিতে পারলো না, একবার সে তাকালো নূরের মুখের দিকে।

মাতা-পুত্রের দৃষ্টির বিনিময়ে বিরাট এক প্রশ্নের জবাব দেয়া-নেয়া হয়ে গেলো যা বুঝতে পারলেন না মিঃ আহমদ।

রহমানকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেয়া হলো।

রহমান তার ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো, যাবার সময় বললো– আবার আসবো বৌরাণী।

চলে গেলো রহমান।

কিন্তু মনিরা যখন ওকে বিদায় জানাচ্ছিলো তখন তার দু'চোখের পাতা সিক্ত হয়ে উঠেছিলো। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে রেখেছিলো মনিরা। রহমানও সবার অলক্ষ্যে চোখ মুছে নিলো।

তারা মাথুন দ্বীপ থেকে ফিরে এসেছে বটে কিন্তু তারা তাদের অতি প্রিয়জনকে হারিয়েছে, যাকে তারা কোনোদিন পাবে না।

রহমান বা তার দল জানে না যে তাদের সর্দার জীবিত আছে এবং এক জলদস্যর জাহাজে আছে। জানলে এত দুঃখ ব্যথা হতো না কারণ তারা জানে সর্দারকে কেউ কোনোদিন আটক করে রাখতে পারবে না। বনহুর জীবিত আছে- এ কথা মনির বা রহমান জানে না বলেই ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে তারা। তাদের ধারণা বনহুর জীবিত নেই, সেই বিস্ময়কর গুহায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। অন্তরের ব্যথাকে প্রকাশ করার উপায় নেই, তাই নীরবে অশ্রু মুছে নিলো ওরা সবার অলক্ষ্যে।

সরকার সাহেব অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। একে তার বয়স হয়েছে, তারপর নানা অসুখ বিসুখ দেখা দিয়েছে তার। তিনিও মনিরাকে ফিরে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন।

সরকার সাহেব এবং মরিয়ম বেগম মিঃ আহমদ ও তার সহকারিগণকে আপ্যায়ন করলেন। আজ চৌধুরীবাড়ীতে আনন্দের বান বয়ে চললো।

কিন্তু মনিরার মুখে হাসি নেই। অন্তরের ব্যথা অন্তরে চেপে রইলো সে। সবার আনন্দে সে যোগ দিতে পারলো না।

এক সময় বিদায় গ্রহণ করলেন মিঃ আহমদ ও তার সহকারিগণ। আরও অন্যান্য যারা সংবাদ পেয়ে এসেছিলেন তারাও এক এক সরে বিদায় গ্রহণ করলেন।

নূর গম্ভীর হয়ে লক্ষ্য করছিলো তার মাকে। সবার চেয়ে বেশি খুশি সে নিজে কিন্তু তাকে লক্ষ করলে তা বুঝবার যো নেই। নূর চুপচাপ মনিরা এবং মিঃ আহমদের কথাবার্তা শুনছিলো। সে অনুধাবন করছিলো মায়ের অন্তর্ধানের পর কি অবস্থার শিকার হয়েছিলেন তিনি। এ সবই যে মিঃ বি, কে চৌধুরীর ষড়যন্ত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নূর আপন মনে একটু হাসলো, কারণ তার মায়ের হরণকারী নরপশু বি, কে চৌধুরীকে সে নিজ হাতে খতম করেছে। আর কোনো দিন সে দেশ ও দেশবাসীর সর্বনাশ করতে পারবে না। মাদাম বাঈ তার মায়ের মঙ্গল সংবাদ বহন করে এনেছিলো। কে ঐ মাদাম বাঈ আর তার মায়ের সন্ধানই বা সে জানলো কেমন করে? নানা চিন্তা নূরের মনে ভীড় জমাচ্ছিলো।

সবাই যখন বিদায় গ্রহণ করলো তখন নূর মাকে লক্ষ্য করে বললো–আম্মি, এবার তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। যা কষ্ট সহ্য করেছে তা তোমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেই বুঝতে পেরেছি। চলো আগে বিশ্রাম নাও, তারপর কথা হবে। কি বলো দাদীমা, সত্যি বলছি না?

মরিয়ম বেগমের মুখে আজ হাসি ফুটেছে। কতদিন ধরে জায় নামাজে বসে তিনি মোনাজাত করেছেন, হে রহমানুর রহিম, তুমি আমার মনিরাকে ফিরিয়ে এনে দাও। তার মোনাজাত আল্লাহ কবুল করেছেন। তাই তিনি আনন্দে গদগদ, মনিরাকে বুকে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়ের মত আদর করছেন।

নূর যখন মাকে নিয়ে ঘরে এসে বসলো তখন মরিয়ম বেগমও সেখানে এসে বসলেন, মাতা-পুত্রের কথাবার্তা তিনি যেন শুনতে পারেন। বয়স হলে কি হবে মরিয়ম বেগমের মনে আজও আনন্দ হাসিখুশী লেগেই আছে। তিনি নিজকে সব সময় হাসিখুশীতে ভুলিয়ে রাখতে চান, যদিও তার অন্তরে দারুণ একটা ব্যথা গুমড়ে কেঁদে মরে, সে ব্যথা তার একমাত্র পুত্র মনিরের জন্য যাকে তিনি নৌকা ডুবিতে হারিয়েছিলেন। সেদিনের কথা মরিয়ম বেগমের মনে আজও হাতুড়ির আঘাতের মত ঘা দেয়, দেশের বাড়ি থেকে ফিরছিলেন চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগম। তাদের সঙ্গে ছিলো চৌধুরী সাহেবের বোনের মেয়ে মনিরা আর একমাত্র সন্তান মনির। ঝড় উঠলো, মাঝিরা কিছুতেই নৌকা সামলাতে পারলো না, অনেক সাধ্য সাধনা করেও রক্ষা করতে পারলো না। নৌকাখানা মাঝনদীতে ডুবে গেলো, প্রচন্ড ঝড়...চারদিকে জমাট অন্ধকার, কোথায় কে হারিয়ে গেলো। তারপর পরদিন মরিয়ম বেগম দেখলেন তিনি, তার স্বামী আর বোনের মেয়ে রক্ষা পেয়েছেন কিন্তু মনিরকে আর ফিরে পেলেন না। নদী গহ্বরে কোথায় সে হারিয়ে

গেলো। তারপর ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এলো একদিন মনিরের কথা। মন বললো, আবার সে ফিরে আসবে, কিন্তু কবে কোন্ দিন। মায়ের মন সর্বক্ষণ কাঁদতো। পিতামাতা উভয়ে সন্তানকে হারিয়ে মনিরার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের হারানের মানিক। মনিরার রূপ-গুণ, শিক্ষাদীক্ষা, আচার-আচরণে মুগ্ধ ছিলেন চৌধুরী সাহেব ও মরিয়ম বেগম। তাদের ছেলের অভাব মনিরা পূরণ করে রেখেছিলো। কতকটা ভুলেই গিয়েছিলেন তারা তাদের হারানো সন্তান মনিরকে। হঠাৎ একদিন সবার অজান্তে সেই হারানো মানিক ফিরে এলো। মরিয়ম বেগম যখন নিজ সন্তানকে দেখলেন তখন তার দু'চোখে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিলো। সেদিনের সে খুশি, সে আনন্দ তিনি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না। শুধু আল্লাহর দরগায় হাত তুলে শুকরিয়া করেছিলেন প্রাণভরে। বুকে টেনে নিয়ে ছেলেকে আদর করেছিলেন সেদিন। ছোট্ট শিশুটিকে জননী যেমন করে আদর করে ঠিক তেমনি করে।

তার সেই হারানো শিশুসন্তান এখন বিশ্ববিখ্যাত দবনহুর। সর্দার কালু খাঁ তাকে নদীতীরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছিলো। কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো তার কান্দাই জঙ্গলের ভূগর্ভস্থ আস্তানায়। নিঃসন্তান কালু খাঁর মনে পিতৃস্নেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। সে মনির চৌধুরীর নতুন নাম দিয়েছিলো বনহুর– মানে বনের সৌন্দর্য।

তারপর কেটে যায় কত বছর।

সেই শিশু রূপ নেয় ভীষণ আর ভয়ংকরে। নরপশু স্বার্থান্বেষী অমানুষ যারা তাদের রক্ত শোষণকারী, অসহায় দীনহীন শোষিত নিষ্পেষিত মানুষের পরম বন্ধুরূপে, অসৎ উপায়ে যারা ধন উপার্জন করে, ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তাদের সম্পদ কেড়ে নিয়ে অসহায়দের বিলিয়ে দেয়াই তার জীবনের ব্রত। তার সাধনা, তার ব্রত দুঃস্থ মানুষের সেবা। বনহুর প্রতিদান চায় না, সুনাম চায় না, চায় কি করে দেশ ও দশের উপকার হবে, কি করে অনাহারী মানুষের মুখে আহার জুটবে। অন্যায়কারী যারা তাদের গলা টিপে হত্যা করাই তার নেশা। বনহুর উম্মাদ হয়ে পড়ে যখন কোনো মানুষনামী পশু সাধুতার মুখোশ পরে দেশ ও দশের নেতা সেজে বড় বড় বুলি আওড়ায়। তখন তার সহ্য হয় না, নিজকে সংযত রাখতে পারে না।

বনহুর মায়ের বুকে ফিরে এলেও তাকে ধরে রাখতে পারেননি মরিয়ম বেগম। তার জীবনের ব্রত সাধন তাকে বিদ্রোহী করে তুলে ছিলো।

মনিরাকে সন্তানের হাতে সঁপে দিয়ে তাকে সংসারের শিকল পরাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাতেও তিনি পরাজিত হয়েছিলেন। ঘরে আটকাতে পারেননি। তবে একটা আকর্ষণ সন্তানকে টেনে আনতে চৌধুরীবাড়ীতে। মরিয়ম বেগম তাতেই সান্তনা খুঁজে পেতেন, যাক তবুও তো মনিরকে দেখতে পান তিনি।

আজ যখন মনিরা আর নূর পাশাপাশি বসলো, তখন মরিয়ম বেগম তাদের পাশে না বসে পারলেন না। কারণ এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন এখন তারা যা চরম এক অবস্থায় টেনে এনেছে। মরিয়ম বেগম সবকিছু জানতে চান।

নূরকে নিভৃতে পেয়ে মনিরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। একটা জমাট আর্তনাদ তার বুকের মধ্যে দুমড়ে ফিরছিলো। নূর এবং মরিয়ম বেগম অবাক হলেন, একটা অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। তবে কি কোনো সর্বনাশ ঘটেছে তাদের।

নূর বললো–আম্মি, মিছামিছি তুমি কাঁদছো। সব বিপদ তোমার কেটে গেছে। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

নূরের কথায় চোখ তুলে তাকালো মনিরা সন্তানের মুখের দিকে। দু'চোখে তার অসহায় ব্যথা-কাতর চাহনি, বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে বললো–নূর, সবশেষ হয়ে গেছে। তোমার আব্বু আর কোনোদিন ফিরে আসবে না।

মরিয়ম বেগম রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনছিলেন, তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন-কি বললি মা? কি বললি তুই! মনির-আমার মনির আর কোনো দিন ফিরে আসবে না? কোথায় সে। কোথায় তাকে রেখে এলি মনিরা?

নূর অধীর কণ্ঠে বললো–আম্মি, তুমি কি বলছো! আবুকে কি কেউ হত্যা করেছে? বলো আম্মি?

মরিয়ম বেগম ভীষণ উত্তেজিত আর দিশেহারা, পাগলিনী হয়ে পড়েছেন। বললেন-সত্যি করে বল মনিরা আমার মনিরের কি হয়েছে? সে বেঁচে আছে তো?

জানি না, আমি জানি না মামীমা সে বেঁচে আছে কিনা। মাথুন দ্বীপে আগ্নেয়গিরির গুহায় সে প্রবেশ করেছিলো, আর ফিরে আসেনি।

নূর বলে উঠলো–মাথুন দ্বীপ! আম্মি তুমি কি বলছো মাথুন দ্বীপ তো এক অজানা বিস্ময়কর দ্বীপ! যে দ্বীপে কোনো মানুষ কোনোদিন যেতে পারেনি…

হাঁ, হাঁ বাবা, সেই মাথুন দ্বীপে এক বিস্ময়কর গুহায় সে প্রবেশ করেছিলো। শত নিষেধ সত্ত্বেও সে প্রবেশ করেছিলো কিন্তু ফিরে সে এলো না আর। দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো মনিরা।

আচমকা এ আঘাত মরিয়ম সইতে পারলেন না, বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন। নিশ্চুপ হয়ে গেলেন, কোনো কথা তার কণ্ঠ দিয়ে বের হলো না।

মরিয়ম বেগমের অবস্থা দেখে নূর উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো, তাড়াতাড়ি শয্যা শুয়ে দিয়ে ডাকলো-দাদীমা, দাদীমা কথা বলছেনা কেন? কথা বলো দাদীমা?

মনিরা ডাকলো-শামীমা! মামীমা! এমন হলো কেন? কথা বলো।

নূর চিৎকার করে উঠলো-সরকার দাদু! সরকার দাদু! ডাক্তার ডাক্তার-ডাক্তার ডাকুন!

বৃদ্ধ সরকার সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। তিনি ডাক্তার ডাকতে ছুটে গেলেন।

ডাক্তার এলেন কিন্তু মরিয়ম বেগম তেমনি নির্বাক রইলো। শুধু মাঝে মাঝে আমার মনির, আমার বাবা…অস্পষ্টভাবে বলতে লাগলেন। মাতৃস্নেহ কত গভীর কত হৃদয়গ্রাহী। মরিয়ম বেগম পুত্রশোকে শয্যাশায়ী হলেন।

চিকিৎসা চললো।

নূর দাদীমার হঠাৎ এই অসুস্থতার জন্য ভীষণ চিন্তিত হলো। একে পিতার সংবাদ তাকে অত্যন্ত ব্যথাকাতর করে তুললো তারপর মাকে সব সময় অশ্রুবিসর্জন করতে দেখে সেও বিচলিত হয়ে পড়লো, গোপনে সেও অশ্রু বিসর্জন করে চললো। নূরের মনে অনেক স্মৃতি ভেসে উঠতে লাগলো। তার আব্বু দস্যু বনহুর একথা সে ছোটবেলায় জানতো না, তার আব্বুর মত সুন্দর সুপুরুষ নূর কোথাও দেখেনি। শান্ত গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ তার কণ্ঠস্বর, নূরকে অভিভূত করতো। তার আব্বুকে ভীষণ ভালবাসতে নূর, যদিও তার আব্বু মাঝে মাঝেই কোথায় চলে যেতো আর খুঁজে পেতো না সে। কতদিন কত অভিমান হয়েছে।

কত রাগ হয়েছে আর তারা আব্বুর সঙ্গে কথা বলবে না সে। কিন্তু সব রাগ অভিমান কোথায় উবে গেছে যখন তার আব্বু এসে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিয়েছে তার দুটি গাল। আব্বুর সোহাগ তার জীবনে পরম সম্পদ ভাবতে নূর তার আব্বুরও মত কার ও আব্বু হয় না। তারপর যখন সে জানলো তার আব্বু সাধারণ মানুষ নয়, আসল পরিচয় যখন উদঘাটিত হলো তখন ভীষণ দুঃখ পেলো নূর। তার ঘৃণায় মন ভরে উঠছিলো সেদিন। তার আব্বু দস্যু বনহুর। যে দস্যু বনহুর মানুষের আতঙ্ক। যে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য কান্দাই সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন সেই দস্যুই তার পিতা। সেদিন নূর উম্মাদের মত হয়ে উঠেছিলো। তারপর যখন সে গভীরভাবে ভাবতে লাগলো, যতই সে দস্যু বনহুরকে নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো ততই তার মন দীপ্ত অহংকারে ভরে উঠলো। সে এমন একজন ব্যক্তির সন্তান যিনি সাধারণ মানুষের মত নন। অন্যায় অত্যাচারীদের দমনকারী তার আব্বু, নরপশু শয়তান যারা তাদের যমদূত তার আব্বু, দুস্কৃতিকারী অসৎ যারা তাদের রক্ত শোষণকারী তার আব্বু,...নূর নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেছিলো ঐ দিন, সত্যি তার পিতা দস্যু হলেও তিনি মুখোশধারী মানুষনামী জীবগুলোর মত নরাধম, অমানুষ নন...তিনি উদার, মহৎ...।

নূরকে চিন্তাযুক্ত দেখে মনিরার মনটা হু হু করে কেঁদে ওঠে। ভাবলো কথাটা না বললেই হয়তো ভাল হতো। সে তত আর ফিরে আসবে না কোনোদিন। সে এমন মানুষ যার পরিণতি একদিন এমনই হবে...স্বামীর ওপর একটা ব্যথাভরা অভিমান মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মনিরা নিজেকে শক্ত করে নিলো, মনের যন্ত্রণাকে সে প্রকাশ করবে না।

সেদিন আরফান এলো।

নূর আর মনিরার সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করলো। দুঃখ করলো আরফান মরিয়ম বেগমের অবস্থা দেখে। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেখে চিন্তিত হলো সে।

অনেক ওষুধপত্র খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু কোনো ফল হচ্ছে না।

আরফান বললো–নূর, আমি সেদিন একটা অপরাধ করেছিলাম। অবশ্য আমার মনের তাগিদে...কথাটা বলে সে পকেট থেকে একটা স্বর্ণবলয় বের করে মনিরার সামনে ধরলো।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো মনিরা আরফানের মুখের দিকে, বললো–এ বলয় তুমি কোথায় পেলে?

নূরও কম অবাক হয়নি, বললো সে-এ বলয় আম্মির হাতে ছিলো। তুই কি করে পেলি আরফান?

আরফান মৃদু হেসে বললো–আমিই সেদিনের সেই সাধক বাবাজী!

মনিরা অবাক হয়ে বললো–তুমি! তুমি সেই সাধক বাবাজী?

হাঁ খালাম্মা একটু হেসে বললো আরফান-বিশেষ কোনো কারণে আমি সেদিন সাধক সেজে আপনার ঘোড়ার গাড়ীর পথ রোধ করেছিলাম।

বিশেষ কারণ! অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো নূর।

আরফান বললো–যখন ঘোড়াগাড়িটি হীরা ঝিলের নিকটবর্তী পথ দিয়ে অতিক্রম করছিলো তখন একটি দুষ্কৃতিকারী দল ঐ গাড়িখানাকে আটক করার ষড়যন্ত্র করছিলো এবং আমি তা জানতে পারি আরও জানতে পারি ঐ গাড়িখানাতে মিসেস মনিরা ফিরে আসছেন। ঘটনা সত্য কিনা তাই জানতে আমি সেদিন গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করে গাড়িখানার পথ রোধ করেছিলাম এবং দুস্কৃতিকারিগণ যখন জানতে পারলো এক সাধক বাবাজী ঐ গাড়িখানার ওপর দৃষ্টি রেখেছেন তখন তারা আড়াল থেকে সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলো। আমি যা জানতে পেরেছিলাম তা যে সত্য তার প্রমাণও পেয়েছিলাম। সত্যি নূর খালাম্মার বলয় নিয়ে আমি মাথায় বুকে স্পর্শ করিয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিলাম, স্বচক্ষে দেখেছিলাম তিনি জীবিত এবং সুস্থ অবস্থায় ফিরে এসেছেন।

নূর বললো–তুই আমাকে কিছু বলিসনি কেন আরফান?

কিছু কারণ ছিলো, যে কারণে তোমাকে বাদ দিয়েই আমি গোপনে সন্ধান চালিয়েছিলাম। আমি সব কথা বলবো তোমাকে নূর।

কি কথা?

নতুন একটি দলের সন্ধান আমি পেয়েছি, যারা কান্দাই শহরে নিরীহ জনগণের সর্বনাশ সাধন করে চলেছে। এরা কারা জানার জন্য আমি তোমার অজ্ঞাতে

সন্ধান চালিয়ে ছিলাম এবং কৃতকার্য হয়েছি। দুস্কৃতিকারীদের আড্ডাখানার সন্ধান আমি পেয়েছি…

সত্যি বলছো? বললো নূর। আরফান গম্ভীর গলায় বললো–এখন তোমার সহায়তা দরকার। পুলিশ মহলকে আগেই কিছু জানাইনি, কারণ আমি চাই ঐ দুস্কৃতিকারী দলকে সমূলে উৎপাটন করতে।

মনিরা বলয়টা হাতে পরে নিলো অন্যমনস্কভাবে। তার চিন্তাধারা তখন অনেক দূরে, অনেক পেছনে চলে গেছে। স্বামীর মুখখানা বারবার মনে পড়ছে তার।

[পরবর্তী বই বনহুর ও মাদাম বাঈ]

পূর্ববর্তী:

« ৮.০৬ জাভেদ ও নরখাদক

পরবর্তী:

৮.০৮ বনহুর ও মাদাম বাঈ (১) »